নভেম্বর ২০১৬ ▪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

জেল হত্যা দিবস

বাংলাদেশের প্রবহমান নদনদী

শীতের আগমন

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

নভেম্বর ২০১৬ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৩

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম *তাজউদ্দীন আহমদ*

ক্যাপটেন এম মনসুর আলী *এএইচএম কামারুজ্জামান*

সম্পাদকীয়

৩ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের একটি শোকাবহ দিন। এদিন ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই গ্রন্থিতে গাঁথা। এ বিষয়ে বর্তমান সংখ্যায় একটি বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে। ঋতু বৈচিত্র্যে আবর্তিত বাংলার প্রকৃতি। এ বিষয়ে রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন ও নিবন্ধ। নদনদী বাংলার প্রাণ। আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিল্প, সভ্যতা ও জীবন-জীবিকায় নদনদীর অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। নদীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আমাদের অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। এ সংখ্যায় নদীকে নিয়ে রয়েছে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

এ সংখ্যায় নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের ওপর রয়েছে একটি নিবন্ধ। মাদকের অপব্যবহার রোধ ও যুবসমাজকে রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া নিয়মিত বিভাগে গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস নিয়ে সাজানো হয়েছে সংখ্যাটি।

আশা করি সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

সিনিয়র সম্পাদক
শিবপদ মণ্ডল

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
মোস্তফা কামাল ভূইয়া

সহকারী শিল্প নির্দেশক
গনেশ চন্দ্র দেবনাথ

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩৩১২০, ৯৩৩৩১৪৯, ৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

জেল হত্যা
পনেরোই আগস্টের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ঘৃণ্য অপচেষ্টা ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

তেসরা নভেম্বর
মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায় ৮
শাফিকুর রাহী

নারীর অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা ১১
মাহবুব রেজা

মাদকের অপব্যবহার রোধ ও যুবসমাজকে রক্ষায় সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ ১৭
বাকী বিল্লাহ

সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ২০
শামসুজ্জামান শামস

উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ২২
সৈয়দ শাহরিয়ার

বাংলাদেশের প্রবহমান নদনদী ২৩
সাইয়েদা ফাতিমা

বৈচিত্র্যময় শীত ঋতু ২৫
অসিত কুমার মণ্ডল

পুত্র : অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক চলচ্চিত্র ২৮
সুফিয়া বেগম

সুন্দরী ভিয়েতনামে রাষ্ট্রীয় আতিথ্য ২৯
কালী রঞ্জন বর্মণ

গল্প

নোভা ৩৪-৩৬
রুহুল গণি জ্যোতি

কবিতাগুচ্ছ ৩৭-৩৯

মাশুক চৌধুরী, শাহরিয়ার নূরী, নাজমুল হাসান, জাহাঙ্গীর খান বাবু, সমীরণ বড়ুয়া, সাদিয়া সুলতানা, মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ, খাইরুল ইসলাম তাজ, রোকসানা গুলশান, মিলি হক, কল্পনা সরকার, কমল চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৪০-৪৩
সাগরিকা নাসরিন

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম ৪৪
দেলওয়ার বিন রশিদ

তথ্যপুঁজি ৪৬
ফারিহা রেজা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
আমাদের স্বাধীনতা ৫০
জাতীয় ঘটনা ৫০
উন্নয়ন ৫২
নারী ৫৩
শিক্ষা ৫৪
প্রতিবন্ধী ৫৫
জেন্ডার ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
সংস্কৃতি ৫৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
কৃষি ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬০
যোগাযোগ ৬১
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬২
চলচ্চিত্র ৬৩
আন্তর্জাতিক ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

জেল হত্যা

পনেরোই আগস্টের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ঘৃণ্য অপচেষ্টা

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন মোশতাকের চিরশত্রু। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে সরানো এবং বঙ্গবন্ধুর কাছ ছাড়া করার পেছনে মোশতাকের ষড়যন্ত্র সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিল। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাক তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে সশস্ত্র প্রহরা মোতায়েন করে তাঁকে নজরবন্দি করে রেখেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ কোনোদিন মোশতাককে মেনে নেবেন না, এটা তিনি জানতেন। তাই তাঁর কাছে যাননি বা কাউকে পাঠাননি। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

নারীর অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির অনন্য পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার অগ্রভাগেও ছিলেন বাংলার সাহসী নারীরা। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১১

বাংলাদেশের প্রবহমান নদনদী

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র তার গতি পরিবর্তন করলে যমুনা নদীর উত্থান ঘটে। ধলেশ্বরী যমুনার শাখা নদী। গত ১০ হাজার বছরে গঙ্গা বিভিন্ন সময়ে তার মূল প্রবাহ এবং শাখা নদীসমূহের প্রবাহ পথ পরিবর্তন করেছে। ২/৩ হাজার বছর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ মধুপুর গড়ের পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হতো। ব্রহ্মপুত্র নদের পরিবর্তনের সাথে দেশের অন্যান্য নদনদীর গতি পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র অনুসারে ব্রহ্মপুত্র নদ গড়ের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ বিশাল কলেবরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–২৩

নিবন্ধ

জেল হত্যা

পনেরোই আগস্টের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ঘৃণ্য অপচেষ্টা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের আর একটি শোকাবহ দিন। পনেরোই আগস্টের ধারাবাহিকতায় এদিন বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন ও প্রিয় সহচর এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাঁরা ছিলেন মুজিবনগর সরকারের (প্রথম বাংলাদেশ সরকার) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মবীর। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, ফলে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

উনিশশ পঁচাত্তর থেকে দুই হাজার ষোলো, একুনে একচল্লিশ বছর। এই দীর্ঘ বছরগুলো আমাদের তথাকথিত গুণী সমাজ জেল হত্যাকে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই বিষয়টি ছিল নিষিদ্ধ। তখন খুনিদের বিচারতো দূরের কথা, বিষয়টি নিয়ে কথা বলা ছিল দুরূহ। এমনিতেই এটি দায়মুক্ত ছিল 'খোনকার' মোশতাক আহমদ ও জিয়াউর রহমানের বদৌলতে।

কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষ জানে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুটি ঘটনাই পরস্পর একই গ্রন্থিতে বাঁধা এবং একাত্তরের চেতনা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমূলে বিনাশ করার জন্যই এ ঘটনা গভীর ষড়যন্ত্র করে ঘটানো হয়েছিল। যার উৎস-মূল একাত্তরের মুজিবনগর সরকারের একজন সদস্য, যিনি মার্কিনী চর হিসেবে সারা জীবনই নিন্দিত ছিলেন।

আমরা সবাই জানি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশ। কেউ ঘরে এসে স্বরাজ তুলে দিয়ে যায়নি। একাত্তরে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করতে হয়েছে। একটি তথাকথিত স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের ঘাগু সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের জিততে হয়েছে। বিনিময়ে দিতে হয়েছে ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম-ইজ্জত। সেই যুদ্ধে কেবলমাত্র ভারতই সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। রাশিয়াসহ ইউরোপের কিছু রাষ্ট্র আমাদের সমর্থন করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে দুই পরাশক্তি মার্কিন– চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। অবশ্য দেশ দুটির স্বাধীনচেতা জনগণ আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন। তখন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল এমনই। দুই পরাশক্তিকে টেক্কা দিয়ে আমাদের যুদ্ধ–জয় গোটা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ নভেম্বর ২০১৬ জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন –পিআইডি

দেশ শত্রুমুক্ত হলে দেশি ও বিদেশি শত্রুরা একজোট হয়ে লন্ডনে বসে একাত্তরের ঘাতক গোলাম আজম–এর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি করে। আর ঢাকায় বসে 'খোনকার' ষড়যন্ত্রের ষোলোকলা পূর্ণ করে। একদল বিপথগামী আর্মির সহায়তায় তারা আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং অবৈধভাবে দেশের শাসনকর্তা বনে যায়। এরপর শুরু হয় হত্যা, ক্যু, শোষণ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষজনের ওপর নির্যাতন। বিতাড়িত ও পালিয়ে থাকা স্বাধীনতা বিরোধীরা ১৬ আগস্ট থেকে দেশে ফিরতে শুরু করে। দেশের অভ্যন্তরের আল শামস-আল বদরের সক্রিয় সদস্যরা তাদের সাথে যোগ দিয়ে একাত্তরের বদলা নিতে শুরু করে। আর 'খোনকার' মোশতাক বঙ্গভবনে বসে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী জিয়া, ফারুক–রশীদ গং, ওসমানী, মাহবুবুল আলম চাষী, তাহেরউদ্দীন

ঠাকুর, কোরবান আলী, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন প্রমুখ–এর সহায়তায় বাংলাদেশের সকল অবকাঠামো বদলাতে শুরু করে। সামরিক শাসন -মোশতাক শাসন– দুইই অবৈধভাবে চলতে থাকে। খোনকার ও জিয়ার অধ্যাদেশের ঘায়ে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে শুরু করে সকল বিধান অবলুপ্ত হয়ে যায়। শুরু হয় হত্যার রাজনীতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে শুরু হয় ক্যু, পালটা ক্যু। যার শুরুটা পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর। তার সাক্ষী এদেশের মানুষ আর একচল্লিশ বছরের ইতিহাস।

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ ৩ নভেম্বর ২০১৬ পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন –পিআইডি

বঙ্গভবনের মসনদে 'খোনকার' আরোহণ করে অবৈধ রাষ্ট্রপতি পদে থাকা পর্যন্ত কোনোদিন ঐ ভবন থেকে বের হয়নি। তখন বঙ্গভবন পরিণত হয় কাশিমবাজার কুঠিতে। ফারুক-রশীদ গ্রুপ তাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিত। একদিন খোনকার রুঢ়কণ্ঠে ফারুক-রশীদকে বলে, শুধু শেখ মুজিব, পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের মারলেই আমাদের নীল নকশার কাজ পূর্ণ হবে না। তাঁর সহযোদ্ধা ও সহকর্মীদেরও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এসব কথা বলার আগে ঐ খোনকার জাতীয় চার নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমরা খুঁজে পাই প্রাক্তন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়্যিদ রচিত *জেল হত্যা* শীর্ষক একটি বইয়ে। বইটিতে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ১৫ আগস্ট সকাল ১০ টায় খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেই মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার- এর সাথে। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মাহবুবুল আলম চাষীসহ আরো কতিপয় উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বৈঠকেই ঠিক করা হলো যে, মোশতাক সরকারকে অবশ্যই আওয়ামী লীগ দলীয় বিশিষ্ট প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের আনুগত্য লাভ করতে হবে।

আলোচনার এক পর্যায়ে তাহের ঠাকুর বলেন, 'আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট সাহেবই ঠিক করবেন কাকে কাকে নিয়ে তিনি একটি বেস্ট টিম গঠন করতে পারবেন। ঠাকুরের কথায় কর্নেল ফারুক রহমান বলে উঠল– 'স্যার, লিস্টটা চূড়ান্ত করার আগে আমরা যেন একটু দেখতে পাই।' এই কথায় সবাই ফারুকের দিকে একবার তাকালেন। মোশতাক চকিত হেসে জবাব দিলেন, 'তা তো অবশ্যই'। খোন্দকার মোশতাক আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের খুঁজে বের করে তাদের কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন। অবশ্য যাদের তিনি মন্ত্রী বানিয়েছিলেন, এদের মধ্যে শাহ মোয়াজ্জেম, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছাড়া আর কারো কাছ থেকে তিনি তেমন কোনো উদ্যোগ পাচ্ছেন না। সবাই যেন কেমন নিষ্প্রাণ, যন্ত্রচালিত। কেবল অতি উৎসাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ।

এমতাবস্থায় ১৭ আগস্ট ওবায়দুর রহমান মনসুর আলীকে মোশতাকের কাছে নিয়ে গেলেন। মোশতাক তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের আহ্বান জানালেন। মনসুর আলী তার কোনো জবাব না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মোশতাকের মুখের দিকে ঘৃণার চোখে তাকিয়ে থাকলেন। মোশতাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–কী দেখছেন অমন করে? মনসুর আলী বললেন– দেখছি তোমাকে, আর ভাবছি বঙ্গবন্ধুকে। মোশতাক, তুমি শেখ মুজিবকে হত্যা করলে–করতে পারলে। আবেগে–উদ্বেগে–কান্নায়–ঘৃণায় বুজে এল তাঁর কণ্ঠ। মোশতাক বুঝলেন, মনসুর আলীকে পাওয়া যাবে না। তার ইঙ্গিতে ওবায়দুর রহমান মনসুর আলীকে নিয়ে গেলেন। ওবায়েদ তাঁকে বলেছিলেন–মনসুর ভাই, আপনি সব পণ্ড করে দিলেন। রাজনীতিতে আগের স্থান নেই, এটা আপনার জানা কথা। আপনি প্রেসিডেন্টের কথায় রাজি হলে ভালো হতো। মনসুর আলী সেদিন ওবায়েদকে আর কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। সেই থেকে ২২ আগস্ট গ্রেফতার হয়ে ঢাকা জেলে যাওয়া পর্যন্ত মনসুর আলী ছিলেন বেইলি রোডের বাড়িতে নজরবন্দি।

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন মোশতাকের চিরশত্রু। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে সরানো এবং বঙ্গবন্ধুর কাছ ছাড়া করার পেছনে মোশতাকের ষড়যন্ত্র সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিল। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাক তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে সশস্ত্র প্রহরা মোতায়েন করে নজরবন্দি করে রেখেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ কোনোদিন মোশতাককে মেনে নেবেন না, এটা তিনি জানতেন। তাই তার কাছে যাননি বা কাউকে পাঠাননি।

মোশতাকের ধারণা ছিল শান্ত প্রকৃতির সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নরম মানুষ কামারুজ্জামান হয়ত তার কথা মানবেন। তাদের কাছে যখন তাহের ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেমকে পাঠানো হলো নূরে আলম সিদ্দিকী সমেত তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছিলেন– 'আমার আর কোনো সরকারি পদের দরকার নেই। মোশতাককে বলো আমাকে ছেড়ে দিতে। আমি ময়মনসিংহ চলে যাব। আর কদিনই বাঁচব। একটু অবসর জীবন কাটাতে চাই।'

কামারুজ্জামানের বাসায়ও হানা দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র।

তাদের গাড়িতে বেতারের আপেল মাহমুদও ছিল। ১৯৯৬ সালের পর বেতার- টিভি'র এক সাক্ষাৎকারে কামারুজ্জামানের সহধর্মিণী বলেছিলেন এ তথ্য। সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেছিলেন–খুনিদের ভয় ও ধমকের উত্তরে অটল থেকে কামারুজ্জামান বলেছিলেন– 'পার্টির আর সব লোক না গেলে আমিই- বা যাই কি করে? তারচেয়ে বাকি কটা দিন এমনি থাকি।'

এরপর নানা ঘটনাপ্রবাহ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে তাঁদের নজরবন্দি থেকে বন্দি করা হয় ৯ সেপ্টেম্বর এবং রাখা হয় শাহবাগের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। পরে সেখান থেকে বশে আনতে না পেরে নেওয়া হয় নাজিমউদ্দীন রোডের কেন্দ্রীয় জেলখানায়। সেখানে তাঁরা ৩ নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ চিন্তিত ছিলেন। আপোশ করেননি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বিশ্বাসের সঙ্গে।

জেলখানায় ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, তার প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় বিচারাধীন জেল হত্যা মামলার চার্জশিটে। এই চার্জশিটটি ১৯৯৮ সালের ১৬ অক্টোবর *দৈনিক জনকণ্ঠে* প্রকাশিত হয়। চার্জশিটের বিবরণে বলা হয়:

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর রাত ৪টা থেকে ৫টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। এ সময় হত্যাকারীরা দু'বার কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে চার নেতাকে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর রাত পৌনে ২টার সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জলপাই রঙের একটি জিপ এসে থামে। জিপ থেকে নেমে আসে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র চার সদস্য। এদের একজন রিসালদার মোসলেম জিপ থেকে নেমে এসে কারাগারের জেলারকে জানান ফারুক-রশিদ তাদের পাঠিয়েছে। তারা জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নিয়ে যেতে চায়। ডিআইজি প্রিজন কাজী আবদুল আওয়াল এতে খুব ভয় পেয়ে যান। তিনি এটা জেল কোডের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রিসালদার মোসলেম নাছোড়। তিনি বঙ্গভবনে ফোন করেন। ফোন ধরেন কর্নেল রশিদ। তিনি মোশতাককে দেন। খন্দকার মোশতাক ডিআইজিকে কর্নেল রশিদের কথামতো কাজ করার হুকুম দেন। এই হুকুমের ফলে কারাগারে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যায় চার ঘাতক। তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন নিউ জেল (কেন্দ্রীয় কারাগার-এর) ১ নম্বর সেলে। পরবর্তী সেলে ছিলেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। তাদের সবাইকে জড়ো করা হয় তাজউদ্দীনের সেলে। এরপর খুব কাছ থেকে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। তাজউদ্দীনের পেটে ও হাঁটুতে গুলি লাগে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেও তিনি দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকেন। তাজউদ্দীন বেঁচে আছেন বিষয়টি এক কারাবন্দি দেখতে পায়। সে ঘাতকদের একথা বলে। ঘাতকরা একথা শোনার পর সেলের মধ্যে প্রবেশ করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চার নেতার হত্যা নিশ্চিত করে চলে যায়। তারা কারাগারে প্রবেশ করে রাত ৪টায় আর বের হয় ৫টা ৩৪ মিনিটে। এই দীর্ঘ সময়ে ঘটানো হয় হত্যাকাণ্ডটি। নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে যায় ঘাতক দল। মধ্যরাতে কারা অভ্যন্তরে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটলেও বাইরের পৃথিবীর কেউ তা জানত না। এমনকি সেলের মধ্যেই সকাল ১০টা পর্যন্ত লাশগুলো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। সকাল ১০টার পর কেন্দ্রীয় কারাগারের চিকিৎসকরা সেলে প্রবেশ করে। সেলের মধ্যেই লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন ম্যাজিস্ট্রেট আজমল হোসেন চৌধুরী ও মিজানুর রহমান। এরপর ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন সিভিল সার্জন ডা. ফয়েজউদ্দিন মিয়া ও কারা ডাক্তার রফিক উদ্দিন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডা. পোদ্দার ও ডা. মনোয়ার উল্লাহ। তাঁদের ময়না তদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্টে বলা হয়, গুলিবর্ষণ করে ও বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এভাবেই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের খুনিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে! কিন্তু সেই খুনিরা কে কোথায়? কেউ কেউ ফাঁসির দণ্ড পেয়েছে, কেউ কেউ বিদেশে মারা গেছে। মাহবুব আলম চাষী জলন্ত গাড়িতে সেই মরুময় সৌদিতে মারা গেছে। ঠাকুর যে কবে মারা গেল তা কেউ জানে না। প্রকৃতির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। সময় ও ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। তারাই বিনাশ হয়েছে বিধাতার বিচারে। বাংলার মানুষ একদিন অঝোরে কেঁদেছিল। এ বিচারে দেশ ও জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

আজ আমরা জোর গলায় বলতে পারি বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এই সংগ্রাম আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বটি নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মাতৃভূমির স্বাধীনতা। বাঙালির ইতিহাসে তাদের কীর্তিগাথা চিরকাল জ্বলজ্বল করবে। এখন জাতীয় চার নেতার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি তুলে ধরছি:

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের দামপাড়ায় ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বরাবর কৃতী ছাত্র নজরুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে বিএ (সম্মান), ১৯৪৭ সালে এমএ (ইতিহাস) এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৪৬-৪৭ মেয়াদে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তাঁর বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। পরবর্তীতে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনের জন্য গঠিত সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটির সদস্য হিসেবে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরও এদেশের মানুষের মুক্তি ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ময়মনসিংহে আইনজীবী সমিতিতে যোগদান করেন। খেলাধূলায় সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রবল উৎসাহ ছিল। কৃতী খেলোয়াড় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ও হকি দলের ক্যাপটেন ছিলেন। তিনি ডাকসু'র ক্রীড়া সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অমায়িক ব্যবহার ও মনোমুগ্ধকর আচরণের জন্য তিনি ছাত্র-জনতা-কর্মীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, কয়েকজন বিপথগামী উচ্চাভিলাসী সামরিক অফিসারের হাতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নৃশংসভাবে নিহত হবার পর তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। ২৩ আগস্ট ১৯৭৫, মোশতাক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখে এবং বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর খুনিরা নির্মমভাবে হত্যা করে ৩ নভেম্বর।

তাজউদ্দীন আহমদ

১৯২৮ সালে ঢাকা জেলার (বর্তমান গাজীপুর) কাপাসিয়া উপজেলার দরদরিয়া গ্রামে তাজউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে মেধাবী ছাত্র তাজউদ্দীন মধ্য ইংরেজি বৃত্তি পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হয়ে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি এলএলবি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ রাজনীতি ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাজউদ্দীনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন থেকে তাঁরা একসাথে রাজনীতি করেছেন। তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে যে কজন নেতা ১৯৪৮ সালে মি. জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫ নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

ক্যাপটেন এম মনসুর আলী

মুহম্মদ মনসুর আলী (ক্যাপটেন) ১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার কুড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরাজগঞ্জ বিএল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, পাবনা এডওয়ার্ড

কলেজ থেকে আইএ, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ (১৯৪১) এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ (১৯৪৫-১ম শ্রেণি) ও এলএলবি (১ম শ্রেণি) ডিগ্রি অর্জন করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মনসুর আলী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা থেকে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত পাঁচবার বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে পাবনা বার- এ আইন পেশায় যোগদান করেন। পর পর তিনবার পাবনা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-১৯৫০ পর্যন্ত তিনি পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। একই সময়ে মুসলিম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপটেন থাকায় এম মনসুর আলী দেশব্যাপী 'ক্যাপটেন মনসুর আলী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তিনি সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ কয়েকজন উচ্চাভিলাসী সামরিক অফিসারের হাতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নৃশংসভাবে নিহত হলে তিনি আত্মগোপন করেন। ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ মোশতাক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। মোশতাক তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ভোররাতে তিনি নিহত হন।

এ এইচ এম কামারুজ্জামান

এ এইচ এম কামারুজ্জামান ১৯২৬ সালে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে আইন পেশায় যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সভাপতি এবং ১৯৫৬ সালে পৌর কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হন।

২৩ আগস্ট ১৯৭৫ মোশতাক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত এবং সভ্য সমাজের সকল আইন লঙ্ঘন ও অগ্রাহ্য করে অবৈধ রাষ্ট্রপতি খোনকার মোশতাকের নির্দেশে কারাগারে অনুপ্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির হাতে গুলি ও বেয়নেট বিদ্ধ হয়ে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ভোররাতে তিনি নিহত হন।

স্মরণের মণিকোঠায় আমাদের জাতীয় এই চার নেতা চিরকাল জ্বলজ্বল করবেন এবং এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবে। বাঙালি কোনোদিন তাঁদের ভুলবে না।

আমরা সকলেই জানি বর্তমান সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় এসে নাজিমউদ্দীন রোডের কারাগারে জাতীয় চার নেতার স্মরণে তাজউদ্দীন আহমদের সেই কক্ষটি 'শহিদ স্মৃতিকক্ষ' হিসেবে সংরক্ষণ করেন এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। সম্প্রতি এই কারাগারটি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জের অদূরে রাজেন্দ্রপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জেল হত্যার সেই সংরক্ষিত কক্ষ ও স্মৃতিস্তম্ভ যথাযথ মর্যাদা সহকারে যথাস্থানে সংরক্ষণ করা হবে– এটাই দেশবাসীর একান্ত কামনা।

জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বিশ্বাসঘাতকতা করেননি দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে। এ কারণেই তাঁরা বাংলা মায়ের অমর সন্তান, ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমরা চিরকাল তাঁদের স্মরণ করব।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

তেসরা নভেম্বর

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়

শাফিকুর রাহী

দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম আর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে ভিনদেশি দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় মাতৃভূমি রক্তাক্ত হয় সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতার হিংস্র থাবায়। মাটি ও মানুষের মুক্তির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা জনম বাংলা ভাষার সংগ্রাম, স্বাধিকার ও অধিকার আন্দোলনের আপোশহীন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন অত্যন্ত সফলতা ও দক্ষতার সাথে তাদের অন্যতম অকুতোভয় মুজিব সৈনিক চার জাতীয় নেতাকে রাতের আঁধারে কারাগারের ভেতর নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল পথভ্রষ্ট সামরিক গুপ্তঘাতকদের গুলিতে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম *তাজউদ্দীন আহমদ* *ক্যাপটেন এম মনসুর আলী* *এএইচএম কামারুজ্জামান*

তেসরা নভেম্বরের সেই মধ্যরাতের হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল বাংলাদেশের মানচিত্র। বাঙালি জাতির হাজার বছরের গর্বিত সব অর্জনকে ধ্বংস করার এক জঘন্য হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় তেসরা নভেম্বর জেলখানায় বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর অতি ঘনিষ্ঠ চারজন বীর সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়। যা ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য হত্যাযজ্ঞ। বাঙালি জাতির সেই দুঃসহ ভয়ংকর অধ্যায়ের সূচনা করেছিল দেশীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী সাম্রাজ্যবাদের এ দেশীয় ঘাতক দালালরা।

সেই খুনি জালিম জল্লাদরা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে ভিন্ন পথে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে। তাদের অশুভ মনোকাঙ্ক্ষা হয়ত সফল হয়নি, কিন্তু নানারকম বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় পরও বাঙালি জাতিকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই দেশদ্রোহী ঘাতকরা আজও এ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার অব্যাহত রেখেছে। আজও সেই মানবতার দুশমন ঘৃণ্য অপরাধীরা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নানা অশুভ কায়দায় দানবীয় হুংকার ছাড়ে। যা এদেশের সচেতন-শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। মধ্য আগস্ট আর তেসরা নভেম্বরের সেই কালো অধ্যায় থেকে জাতি আজও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। আজও দেশ এবং দেশের বাইরে মানবতার দুশমন মাটি ও মানুষের শত্রুরা তাদের হিংস্র অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এসব গুপ্ত-ঘাতকদের লালনপালনকারীদেরও সমূলে উৎখাত করতে হবে। না হলে এরা দেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেবে। সেই দেশদ্রোহী ঘাতকরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে পাক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের মূল শিকড়ে আঘাত হানতে হবে খুব কৌশলে। যাতে তারা আর এ পবিত্র ভূমিতে কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

পঁচাত্তরের সেই ভয়ার্ত কালরাতের বিভীষিকাময় দুঃসহ দুর্গতির কথা মনে হলে রক্তাক্ত হয় বাঙালির হৃদপিণ্ড, স্তম্ভিত হতে হয় বিবেকবান মানুষকে। এদেশের পবিত্র জমিনে আর যেন কখনো ওই খুনি ঘাতকচক্র কোনোভাবেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। দেশে এবং দেশের বাইরে আজও অশুভ হিংস্র দানবরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য যে বীর সিপাহসালার জীবনমরণ সম্মুখ সমরে মাটি ও মানুষের মুক্তি আর স্বাধিকার আন্দোলনে দুঃসাহসী বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে তা আপন টানে, আপন মহিমায়।

অথচ সে, দেশপ্রেমী বীর সন্তানদের কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, কারাগার সেলের ভেতর। জনমনে প্রশ্ন জাগে, কারা এমন আদিম বর্বরোচিত নির্মম হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। কার হুকুমে তেসরা নভেম্বর মধ্যরাতে ঘুমন্ত বাংলাদেশের হৃদপিণ্ডকে রক্তাক্ত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ নভেম্বর ২০১৬ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জাতীয় চার নেতার স্মরণসভায় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করেন –পিআইডি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী– যাঁদের অমূল্য অবদান, রক্তঋণ কোনোদিন বাঙালি জাতি শোধ করতে পারবে না। যতদিন বাঙালি জাতি বিশ্ব মানচিত্রে টিকে থাকবে ততদিন সেই মহান চার জাতীয় নেতা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন, আমরা তাঁদের সেই মহান আদর্শে উজ্জীবিত হবো, জাতির যে-কোনো সংকট সন্ধিক্ষণে শক্তি ও সাহস পাবো। তাঁদের সেই অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো, তাঁদের বীরত্বের গর্বিত গরিমায় এদেশের মানুষ আলোর পথের অভিযানে অংশ নিয়ে জীবনজয়ের গানে উদ্ভাসিত করবে মানবিক ভূগোল। মধ্য আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরাই ৩ নভেম্বরের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।

সেই গণমানুষের দুশমন বঙ্গবন্ধুর উদারতা আর গভীর ভালোবাসার সুযোগে ঘৃণ্য অপকর্মে মেতে উঠেছিল। সেই ভয়ংকর নরপশুদের হিংস্র অপকর্ম আজও দেশে অব্যাহত রয়েছে। সেই গুপ্তঘাতকরা সুযোগ পেলেই ছোবল মারছে, যা এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। সেই দেশদ্রোহী ঘাতকরা আজো দেশের ভেতরে জঙ্গি অপতৎপরতায় যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায় তা দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়ংকর।

একটি অপচক্র প্রচার করে থাকে যে, পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর কোনো প্রতিবাদ হয়নি। আসলেই এটা একটা চরম মিথ্যাচার! কারণ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদে মানুষ যেমন শোকে স্তম্ভিত হয়েছে, তেমনই কেউ কেউ প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আসল কথা হলো– ওই সামরিক হন্তারকরা সেই সময় এ ধরনের কোনো সংবাদ প্রচার করতে দেয়নি। সেকারণে কতিপয় দুষ্কৃতকারী চরম জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির পিতার শোকে পাথরপ্রায় সকল লোকালয়। ক্ষোভে-ক্রোধে স্তম্ভিত বাকরুদ্ধপ্রায় সকল মুজিবপ্রেমী সচেতন নাগরিক সমাজ। কী এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল বাংলার আকাশ–বাতাস। শুধু শোকের মাতম বেদনাবিধুর বিউগল যেন বেজে উঠেছিল। মধ্য আগস্ট আর তেসরা নভেম্বরের হত্যাযজ্ঞ একই সুতোয় বাঁধা। পাকমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় দোসররা বাঙালি জাতির উত্থানকে মানতে পারেনি আজও। তারা যে একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল বীর বাঙালির রণকৌশলে সেকারণে তা মানতে আজও তাদের লজ্জা বোধ হয়। অপমানিত বোধ করে সেই হারমাদ হায়নার দল। তারা কীভাবে ভুলে যায় বীর বাঙালির শৌর্যবীর্যের তেজদীপ্ত গর্বিত উত্থানকে? তারা কি জানে না শ্যামলিমা বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা অন্যায়–অবিচারের বিরুদ্ধে হাসিমুখে জানবাজি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে কোনো দ্বিধা করে না! বাঙালি জাতির যে হাজার বছরের গৌরবদীপ্ত সোনালি অধ্যায় রয়েছে তা বিশ্বে অন্য কোনো দেশের নেই। বিস্মৃতপ্রবণ আর আত্মঘাতী জাতির ললাটেও বীরত্বের মহিমান্বিত স্বর্ণতিলক খচিত রয়েছে। তাও কি সে জালিম–জল্লাদদের জানা নেই? না, তারা কখনো তা জানবে না, বুঝবে না। কারণ তারা তো মানবপ্রেম কিংবা দেশপ্রেমের ধার ধারে না। তারা চায় শুধু ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে কিংবা ধর্মীয় লেবাসে বিত্তবেসাতির লোভ–লালসায় অপকর্মকে জাহির করতে।

পঁচাত্তরের সেই তেসরা নভেম্বরের মধ্যরাতের জেল হত্যার নির্মম

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ৩ নভেম্বর ২০১৬ পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

ইতিহাস কি কখনো লিখে শেষ করা যায়? সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বীভৎস সন্ত্রাসের জঘন্য খুনিরা আজ দেখুক, জানুক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কীভাবে বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হচ্ছে নানামুখী মানব কল্যাণের দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে। বিশ্ব দরবারে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে সকল বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ন্যায়-নীতি-সততা ছাড়া কোনো মানুষই বেশিদূর যেতে পারে না। জগৎ জুড়ে সত্য–মিথ্যার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়, অনন্তকাল ধরে মানুষকে সত্য ইতিহাস জানতে হবে, তবেই তো সেই আলোকিত আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

আজ যারা মিথ্যা অসত্যের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে অশুভ চক্রান্তের মধ্যদিয়ে বিবাদ-বিভাজনের বিষবৃক্ষ ছড়াচ্ছে সভ্যতা বিনষ্টের অপচেষ্টায়, তাদের এ সকল অপকর্মকে রুখে দিতে হবে। না হয় মানুষের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে, তখন মানুষ আর পশুত্বের কোনো পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ নামেমাত্র মানুষ কার্যকলাপের বিচারে পশু আর মানুষ হবে সমান। মিথ্যার বেসাতির পথ পরিহার করে সত্য আর শুভবাদের আলোর ছায়াতলে সমবেত হওয়ার এখনই সময়। যে বীর সন্তানেরা এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। তাঁদের মৃত্যু নেই, তাঁরা মরেও অমর। বাঙালি জাতি কালে কালে যুগে যুগে তাদের স্মরণ করবে, তাদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। তাদের গৌরবোজ্জ্বল মহান আদর্শে আগামীকে জয়ের লক্ষ্যে বাধার সকল আঁধার কেটে আপন শিকড়ের সন্ধানে পথ চলবে। তেসরা নভেম্বরের সেই ঘৃণ্য ঘাতকরা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ হয়েছে।

বাঙালির স্বর্ণভূমিতে কোথাও তাদের নামনিশানাও থাকবে না। তাদের নাম উচ্চারণ করবে ঘৃণাভরে। বাঙালি জাতির ধ্যানে-জ্ঞানে চার মহান জাতীয় নেতার অমর স্মৃতি আমাদের শক্তি ও সাহস জোগাবে অগ্রগতি ও উন্নয়নের মহাসড়কে। তাঁদের কর্মময় জীবনের গান উচ্চারিত হবে সমহিমায় বাঙালির মনময়দানে। অপরদিকে যাঁদের অমর আত্মত্যাগের ফলে বাংলা মায়ের কোমল কোলে স্বাধীনতার লাল সূর্য উদিত হয়েছে তাঁদেরকেই প্রাণ দিতে হলো বড়ো নির্মমভাবে, এদেশের কিছুসংখ্যক পথভ্রষ্ট সামরিক হন্তারকের জঘন্য বুলেটের আঘাতে। বিশ্বাসঘাতক হিংস্র হায়নাদের বিচার করাটাও বড়ো চ্যালেঞ্জের ছিল।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এদের বিচারের রায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ যদি বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তবেই সেই শহিদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে আর ত্রিশ লক্ষ প্রাণের অমূল্য আত্মদান আমাদের সব ভেদাভেদ ভুলে সত্যের স্বপক্ষে সাহসী হতে প্রেরণা জোগাবে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জন্ম নেবে শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের মতো বীর সন্তান, বাংলাদেশের প্রতিটি লোকালয়ে জেগে উঠবে একেকজন সৎ ও নিষ্ঠাবান বিচক্ষণ নেতা। ক্যাপটেন এম মনসুর আলীর দুঃসাহসিক আত্মত্যাগের বীরত্বপূর্ণ অহংকারে বাঙালির মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য জীবন বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এএইচএম কামারুজ্জামানের দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ী গর্বিত ভূমিকায় মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার মহিমান্বিত সুবর্ণ অধ্যায়কে মনের গহনে লালন করে আলোকিত আগামীর স্বপ্নবীজ বপন করে আমরা জানান দেব বাঙালির হাজার বছরের উজ্জ্বল বীরত্বগাথা।

আমাদের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে যে চার জাতীয় নেতার বৈপ্লবিক ভূমিকা তা সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। একাত্তরে মেহেরপুরের ঐতিহাসিক আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই চার জাতীয় নেতা। বাংলার প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষ তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় আলোকবর্তিকায় পথ চলবে জীবন জয়ের সাধনায়। তাঁদের দীর্ঘকালের যে অমূল্য অবদান বাঙালি জাতি কখনো ভুলতে পারবে না।

দেশ আজ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশরত্নের দূরদর্শী নেতৃত্বে তা অব্যাহত রাখতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

শুধু কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতকের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের কারণে বাঙালির হাজার বছরের গর্বিত সব অর্জন ম্লান হতে পারে না। বাংলার সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, জ্ঞানীগুণী কিংবা বিদগ্ধজনেরা আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন– এদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি ইতিহাস সচেতন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে-কোনো সময় মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস রাখে। যা শিখিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই আলোকে চার জাতীয় নেতার অসামান্য অবদানকে সামনে রেখে তেসরা নভেম্বরের শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশরত্ন শেখ হাসিনার মানবতার মুক্তির সংগ্রামে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা তাঁর দিন বদলের অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দৃঢ়কণ্ঠে জানান দেব– বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর বিপ্লবী সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান– এ চার জাতীয় নেতার অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় স্মরণ করি এবং এও বলি যে, তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ীপ্রাণ, তাঁরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন আমাদের চিন্তা-চেতনায়। তাঁদের মহান আদর্শে আমরা আলোকিত আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলব বিশ্বনেতা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে।

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ৩ নভেম্বর ২০১৬ পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ ও বিশিষ্টজনেরা –পিআইডি

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

নারীর অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা

মাহবুব রেজা

শত শত বছর ধরে নারী দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, গোত্রে গোত্রে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে প্রতিবাদী নারীকে সবসময় অবদমিত করে রাখা হতো। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা, যোগ্যতা ও শ্রমকে পুরুষ কখনোই মূল্যায়ন করেনি। এই মূল্যায়ন না করার পেছনে নানাধরনের ষড়যন্ত্র, নারীকে দমিয়ে রাখার মানসিকতা কাজ করত। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বিষয়টি বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া তখনকার পিছিয়ে পড়া নারীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক'। শত বছর আগে দেওয়া বেগম রোকেয়ার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। জানা যায়, সাধারণত শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

নৃতত্ত্ববিদ আর ইতিহাসবিদরা তাদের ধারাবাহিক গবেষণা, প্রাপ্ত তথ্যের উপাত্ত আর বিশ্লেষণ দিয়ে এটা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে, পৃথিবীর আদি থেকে এ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত সাফল্য, অর্জন, আবিষ্কার কিংবা এগিয়ে যাওয়া তার সব কিছুর পেছনে অপরিহার্য ভাবে রয়েছে মহীয়সী নারীর অবদান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর শাশ্বত সত্যকে অস্বীকারের একটা প্রবণতা অনেক পুরোনো। তারপরও কথা থেকে যায় এই যে, সত্য সব সময় সত্যই থাকে। নারীর এই অবদানকে অস্বীকার করার মানে হলো সত্যকে চেপে রাখা কিংবা সত্যকে আড়াল করা। সত্যকে চাপা দিয়ে বা আড়াল করে পৃথিবীতে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিকরা বলছেন, যারা নারীর এই অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাবে কিংবা অস্বীকার করার চেষ্টা করবে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করবে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদেরকে বঞ্চিতও করবে কারণ হিসেবে নৃতাত্ত্বিকরা বলছেন, ইতিহাস বড়ো করুণ। ইতিহাস তার প্রকৃত তথ্য অতিরঞ্জিত না করে নির্মোহভাবে সাধারণ মানুষের সামনে উন্মোচিত করে সেটা যত অপ্রিয় সত্যই হোক।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, পুরুষের পাশাপাশি নারীরও রয়েছে অসামান্য ভূমিকা। সেটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু, জীবন ধারণের যে-কোনো পর্যায়ে একজন নারী মমতাময়ীর ভূমিকায়, বন্ধুর ভূমিকায়, সহযোদ্ধার ভূমিকায় থেকে পুরুষকে শক্তি, সাহস, অনুপ্রেরণা আর মনোবল দিয়ে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। নারী-পুরুষের যৌথ চেষ্টায় পৃথিবী আজ আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে–একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী সবসময়ই পুরুষকে সামনে এগিয়ে যাবার মন্ত্র যুগিয়েছে, যুগিয়েছে মানসিক সামর্থ্য। আর সে কারণেই পুরুষের সব অর্জনের পেছনে ক্রীড়নক শক্তি হিসেবে নারী আবির্ভূত হয়েছে–এই প্রতিষ্ঠিত সত্য আজ পৃথিবীর দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নয়ন জরিপ, পরিসংখ্যানসহ যাবতীয় দিক নির্দেশ একথাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীরাও পুরুষের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নয়ন পরিসংখ্যান আমাদের এই তথ্য দিচ্ছে, বাংলাদেশের নারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্ব দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছে। এটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য গর্বের। তবে এক্ষেত্রে নারীর পাশে পুরুষও বাড়িয়ে দিয়েছে তার সহযোগিতার হাত। নারীর পাশে সেও হয়ে উঠেছে সহায়ক শক্তি। নারীরাও পুরুষকে তাদের উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে ধরে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ যেন নারী-পুরুষের সমন্বিত এক যৌথ সংগ্রাম যেখানে দেশের উন্নয়নই মূলকথা।

দুই

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির অনন্য পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার অগ্রভাগেও ছিলেন বাংলার সাহসী নারীরা। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। এভাবে নারী তার নিজস্ব যোগ্যতায় হয়ে উঠেছে দেশ, জাতি, উন্নয়ন আর অগ্রগতির নিয়ামক শক্তি– যা বিশ্বের বুকে আজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও রাখতে হবে সমান অবদান। আর সে কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মতো নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশি সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করেন। যেসব মায়েদের পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহিদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষত শহিদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো ছিল– (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এছাড়া বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের একক প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পর্যায়ক্রমে সমাজের অন্যেরাও এ কাজে এগিয়ে আসেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। তখন এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ছিল বহুমুখী। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল–দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা, নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা, উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা এবং মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তিপ্রথা চালু করা, যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল নামে পরিচালিত হচ্ছে। জানা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সালে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষি ভিত্তিক কর্মসূচির কাজও শুরু হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা– হোস্টেল,শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন, দুস্থ নারীর জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লি অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লি উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

তিন

নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায় ১৮৬০-এর সমসাময়িক সময়ে। সে সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে নারীর ক্ষমতায়নকে বোঝাতো। নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে নানাভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে একটি মহল সুচিন্তিতভাবে কাজ করত। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং আশির দশকে এসে তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নারীর সামগ্রিক অধিকার অর্জনের দাবি বোঝাতো। 'ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ উইথ উইমেন ফর নিউ ইরা'তে নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যার মূল লক্ষ্যই হলো জেন্ডার বৈষম্যবিহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা। এই বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্বের নারীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। নারীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে, সর্বক্ষেত্রে নারীর বিচরণ, ভূমিকা, অংশগ্রহণ–সর্বোপরি ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নে আশাতীতভাবে অগ্রগতি সাধন হয়েছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশ আজ শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয় পৃথিবীতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে কাজ করছে। কীভাবে এই অর্জন তার পর্যালোচনা করতে গেলে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা চলে আসে। বিশেষজ্ঞরা তাদের বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনি ইশতাহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন, নারীর ক্ষমতায়ন আর উন্নয়ন অগ্রযাত্রার নেপথ্যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সমন্বিত উন্নয়ন তত্ত্বের মূল দর্শন হচ্ছে– পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো নারী উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো– যে বিষয়গুলো নারীর অধস্তনতা সৃষ্টি করে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন, নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ, তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে অংশ নিয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি।

নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাহলো– নারীর ক্ষমতায়ন লাভের জন্য আগে নারীর নিজেকেই সচেতন হতে হবে। ক্ষমতায়ন লাভের যে পূর্বশর্তগুলো সেগুলো অর্জন করতে হবে। যারা ক্ষমতায়ন লাভ করবে তাদের সচেতনতার পাশাপাশি সমাজে যারা চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন তাদেরও সচেতন হতে হবে। সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী সমাজের জীবনের বাস্তব দিকগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তার অবস্থান কোথায় তা তাকে উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত সংস্কার হয়নি। এত বৈরি পরিস্থিতির ভেতরেও বাংলাদেশের নারীরা থেমে থাকেননি, তারা তাদের চলার পথকে বিস্তৃত করতে, কন্টকমুক্ত করতে দৃপ্ত পায়ে কদম ফেলেছেন সামনের দিকে। এভাবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে করতে দেশের নারীরা বিশ্ব মানচিত্রে ঘটিয়ে দিয়েছে এক নীরব বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর।

সামাজিক গবেষকরা তাদের গবেষণায় বলেছেন, বাংলাদেশের অজেয় নারীরা বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা, উপেক্ষা, অসম আচরণসহ নানা ধরনের চাপকে থোড়াই পরোয়া না করে আজ সব মাধ্যমে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উদ্যোগ, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যাংক, বীমা, আমদানি-রপ্তানি, প্রকৌশল, আইন ও বিচার বিভাগ, সাংবাদিকতা, প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় নারীদের বিস্ময়কর অগ্রগতি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, বেসামরিকবাহিনী, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের অবস্থান ও

প্রভাব আজ কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা নিজেদের যোগ্যতা, সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে পুরুষের সমকক্ষ এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষকেও পশ্চাতে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন নারী, মহান জাতীয় সংসদের স্পিকার একজন নারী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসেবে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নারীদের শক্ত অবস্থান আজ স্বীকৃত। সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীও একজন নারী, দেশের একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীও একজন নারী–কোথায় নেই নারীদের সরব উপস্থিতি? ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারী কাজকর্মে নারীরা এখন সমান তালে পুরুষের পাশে কাজ করছে। এছাড়া শিল্প-সাহিত্যের সব মাধ্যমে নারীরা দেশে-বিদেশে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়ে দেশের সম্মানকে বিস্তৃত করেছে।

উন্নয়ন বিশ্লেষকরা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তাদের বিশ্লেষণে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে একজন নারী বিধায় নারীর ব্যাপারে পক্ষপাত দেখাচ্ছেন এরকম বলারও কোনো সুযোগ নেই কারণ তিনি সবসময় তাঁর বক্তব্য-বিবৃতিতে আস্থার সঙ্গে এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বাংলাদেশের নারীরা আজ নিজেদের যোগ্যতায় সমাজে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করেছে। নারীরা নিজেরা নিজেদেরকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় একথা বেশ গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করেন, কেউ এসে আমাদের নারীদের হিমালয়ের উঁচুতে তুলে দেয়নি। আমাদের হিমালয় জয় করা নিশাত, ওয়াসফিয়ারা নিজেদের চেষ্টায়, মেধায়, একাগ্রতায় হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু স্থানে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকাকে উড়িয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন। এরকম নানাক্ষেত্রে আজ আমাদের নারীরা এগিয়ে আছে যা অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছে।

চার

সামাজিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, সারা বিশ্বের দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বৈশ্বিকভাবে ২০০০ সালে যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা (এমডিজি) প্রণয়ন করা হয়েছিল জাতিসংঘের মিলিনিয়াম সামিটে, তখন ১৮৯টি দেশ (বর্তমানে ১৯৩টি) এবং কমপক্ষে ২৩টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় মূলত গুরুত্ব প্রদান হয়েছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং মানবাধিকারসহ (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ওপর। মানব সম্পদের উন্নয়ন বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। অবকাঠামো বলতে বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসহ পরিবহণ ও পরিবেশের উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছিল। মানবাধিকার উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল মূলত নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনা, মতামত প্রদানে স্বাধীনতা, সরকারি চাকরিতে সমান অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জীবনের উন্নতি সাধন।

বাংলাদেশে নারী মুক্তির ইতিহাস দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। সুদৃঢ় প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামো, সচেতন সুশীল সমাজের কারণে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ শুরু থেকেই নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) স্বাক্ষর করেছে। সব ধরনের শিক্ষায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাধ্যমিক ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন শেষে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন –পিআইডি

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন জেন্ডার সমতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে (লক্ষ্য-২) বাংলাদেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিট ভর্তির হার ৯৮.৭ (বালক-৯৯.৪ ও বালিকা-৯৭.২)। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মান অর্জনের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে নবম শ্রেণি পর্যন্ত যথাসময়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ, প্রাথমিক স্কুল সমাপ্তি পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সমাপ্তি প্রবর্তন ও শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি অন্যতম।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ও সেবা খাতে নারীর অংশগ্রহণমূলক অগ্রগতি সাধনের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রবর্তন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, যেমন– ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের হার ১৯.৮৭ শতাংশ। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক। অকৃষি খাতে নারীর কর্মসংস্থান বর্তমানে শতকরা ২৫ ভাগ। মাতৃমৃত্যু হার এক লাখে ১৯৪ জন। বাংলাদেশ সরকার জাতীয়ভাবে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার হার বাড়ানো এবং বিশেষ করে নারী শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, যা শিক্ষায় জেন্ডার সমতা তৈরির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অর্জন এনে দিয়েছে। এই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বিশ্বে একটি বেস্ট প্রাকটিস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। একথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত কয়েক দশকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন–বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, দুগ্ধবতী মায়েদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধীভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান করেছে যা অতি দরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা তৈরিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করলেও নারীর প্রতি সহিংসতায় এখনো অনেক পিছিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শতকরা ৬০ শতাংশের বেশি নারী তাদের পারিবারিক জীবনে কখনো না কখনো পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে একথা সত্য এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামোতে নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয়টি কীভাবে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়টি এখনই ভাবতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নারীর ক্ষমতায়নের কোন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আলোচনা এখনই শুরু করতে হবে। ৬ষ্ঠ পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করার জন্য এদেশের নারী সমাজকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন, বাংলাদেশের আরেকটি বড়ো অর্জন হলো স্থানীয় সরকার আইন। এই আইনের ফলে নারীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্বাচিত নারীদের এলাকায় সম্মান ও ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ফলে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা তাদের সমস্যাগুলো সহজেই স্থানীয়ভাবে তুলে ধরতে পারছে।

এমডিজি'র পরবর্তী অবস্থা ও নারী উন্নয়নে যা প্রয়োজন

পৃথিবীর নানা দেশে এমডিজি'র লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ কমবেশি নানা মাত্রায় সফল হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একশ কোটিরও বেশি মানুষ এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামো কী হবে এ নিয়ে জাতিসংঘ সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করছে। এছাড়াও সারা বিশ্বে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন ২০১৫ সাল পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামো যাতে একটি দারিদ্র্যবান্ধব পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন কাঠামো হিসেবে রূপ পায় এবং জনঅধিকারসমূহ প্রতিফলিত হয় সে উদ্দেশ্যে গবেষণা, প্রচারণা ও নীতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য দেশে সুশাসন ও অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। দরিদ্র নারীদের উন্নয়নে প্রচলিত বৈশ্বিক উন্নয়ন মডেলের ভূমিকা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। নারীর জন্য প্রয়োজন একটি নতুন উন্নয়ন মডেল যার লক্ষ্য হবে দেশে দেশে ধনী ও গরিব, নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতার বৈষম্য হ্রাস করা। উন্নয়নের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত জনগোষ্ঠী, জীবন-জীবিকা ও সকলের জন্য টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা। নারীদের জন্য যে নতুন উন্নয়ন মডেলের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে, সেখানে মূলত মোটা দাগে ৪টি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নারীর মালিকানা স্থাপন। দেখা যাচ্ছে যে, ভূমির উপর নারীদের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে পরিবার ও জনগোষ্ঠীর খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার নিশ্চয়তা তৈরি হয়। বৈশ্বিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নয়নশীল দেশে কোম্পানি ও সরকারি দখলে রয়েছে ২০৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কত পরিমাণ জমি নারী, ক্ষুদ্র কৃষকদের মালিকানায় রয়েছে, সেই সাথে কী পরিমাণে থাকা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং মজুরি। নতুন উন্নয়ন মডেলের বিষয়ে ভাবতে হলে প্রথমেই আমাদের শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির বিষয়টি আলোচনায় আনতে হবে, বিশেষ করে নারী শ্রমিকের মজুরির বিষয়টি। মানসম্মত কাজের পরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি ব্যতীত দারিদ্র্য বিমোচন কখোনোই সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, শান্তি ও ন্যায় বিচার বা ন্যায্যতা। একটি ন্যায্য ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার প্রশ্নে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, সুশাসনের শূন্যতা নারী অধিকার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চতুর্থত, সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, এটা শুরু করতে হবে ঘর থেকে এবং সরকারি উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। বহুজাতিক কোম্পানিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রম ও পরিবেশ বিষয়ে কোম্পানিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মানের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নারী অধিকার, জেন্ডার সমতা, টেকসই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বলে মনে করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৪নং সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ MDG's to SDG's-a way forward শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

এছাড়া সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীদের ক্ষমতায়নকে আরো জোরদার করে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে নারী আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়ন লাভের যুদ্ধে এগিয়ে আছে। বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়ন, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন, ভোটের হিসাবে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ, পোশাক রপ্তানিতে প্রথম সারিতে স্থানলাভ ইত্যাদির সবকটির পেছনেই নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে নারীরা এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে মাত্র ৫ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে সংসদে সর্বমোট ৬৯ জন নারী সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র গার্মেন্ট খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী। নানা প্রতিকূলতা, বাধা ডিঙিয়ে তারা এখন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীর ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে নজির রয়েছে। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিধায় এটি এখন আর নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্য নয়। যে-কোনো রাষ্ট্র তথা বিশ্বে মুখোমুখি এমন সব সমস্যার সমাধানের অন্যতম প্রধান ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেবল আন্তর্জাতিক পরিসরে নয়, বাংলাদেশ ও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে যে-কোনো নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আজ নারীরা সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে।

আজকের নারীরা সব ক্ষেত্রে সফল। আজকের নারীরা সব পেশাতেই যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখে চলেছেন। সমাজের সকল অংশে নারীর ক্ষমতায়নের যে চিত্র, সেটা গোটা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত নারীদের সাফল্যে খুশি হয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বাংলাদেশ থেকে আরো নারী কর্মকর্তা চেয়েছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদে নারীদের পদায়ন করা হচ্ছে, যা অতীতে স্বপ্ন বলে চিহ্নিত করেছে কেউ কেউ।

বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি হারে বেড়েছে। পুলিশবাহিনীতে বর্তমানে কর্মরত পুলিশ সদস্যের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৫ জন, যার মধ্যে মহিলা পুলিশ সদস্য সাত হাজার ৫৬২ জন। পুলিশের চাকরিতে নারীদের ১৫ ভাগ কোটা থাকলেও এখন পর্যন্ত কর্মরত আছে ৫ দশমিক ১৭ ভাগ। একসময় পুলিশবাহিনীতে যেখানে শতকরা এক ভাগও ছিল না, আজ সেখানে শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি হয়েছে। চ্যালেঞ্জিং এ পেশায় নারীরা যেমন এগিয়ে আসছে, তেমনি পুলিশ প্রশাসনও নারীর নিশ্চিত অংশগ্রহণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশে নারীরা প্রথম পুলিশ হিসেবে নিয়োগ পান। সেসময় সাদা পোশাক পরে ১৪ জন নারী স্পেশাল ব্রাঞ্চে কাজ করতেন। এরপর ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে নিয়োগ পান নারীরা।

সামরিক পেশাতে গত এক দশকে বাংলাদেশে নারীরা উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়েছেন। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নারী অফিসার থাকলেও ছিল না নারী সৈনিক। কিন্তু এ বছরের শুরুর দিকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারী সৈনিক যুক্ত হয়। এটি নারী অগ্রযাত্রা ও ক্ষমতায়নে একটি মাইলফলক ঘটনা। এছাড়া গত বছর বাংলাদেশের বিমানবাহিনীতে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিমান নিয়ে আকাশে উড়ছিল দুজন নারী। এ বছরই বাংলাদেশের নারীরা বাণিজ্যিক জাহাজে নাবিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সামরিক বাহিনীতে নারীর এ অংশগ্রহণ দেশকে যেমন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।

এছাড়া বর্তমান সরকার বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সেনসেটিভ বাজেট প্রণয়ন করছে, যা নারীর অগ্রযাত্রা ও অংশগ্রহণকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন, ভাবনা, আদর্শ এবং সর্বোপরি চিন্তা-চেতনার শতভাগ প্রতিফলন ঘটবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে। পুরুষের পাশাপাশি আগামি দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে যোগ্য নারীরা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

নিবন্ধ

মাদকের অপব্যবহার রোধ ও যুবসমাজকে রক্ষায় সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

বাকী বিল্লাহ

মাদকাসক্তি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বের অনেক রক্ষণশীল দেশও মাদক সমস্যায় আক্রান্ত। মাদক সমস্যার কারণে বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ নয়। এর সীমান্ত ও সমুদ্র দিয়ে চোরাই পথে মাদক আসছে এবং এর অপব্যবহার হচ্ছে। সংঘবদ্ধ মাদক চোরাচালানি চক্র মিয়ানমার ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সীমান্তকে মাদক চোরাচালানি রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। যার ফলে বাংলাদেশেও মাদকাসক্তি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজের একটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে এই মরণ নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবারে একজন মাদকাসক্ত থাকলে তার কারণে পুরো পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার এই মাদকের অপব্যবহার রোধ ও যুবসমাজকে মাদকাসক্তির সমস্যা থেকে বাঁচাতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও সমস্যা থেকে উত্তরণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়েও বিভিন্ন সংস্থা এবং সংগঠন গড়ে উঠেছে। দেশের স্কুল ও কলেজ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মাদক মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে যে বাধাগ্রস্ত এবং মানুষের স্বপ্নকে পরিবর্তন করে দেয় সেসম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সরকার সুষ্ঠু জাতি গঠনের জন্য মাদকমুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক, গণমাধ্যম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকার মাদকের প্রবাহ রোধ ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মাদক বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদক একটি মরণ নেশা। যে-কোনো ধরনের মাদকই মানুষকে শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মাদক জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যার পরিণতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। মাদক সেবনের কারণে মানুষের রক্তচাপ যেমন বেড়ে যায় তেমনি তার লিভার, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি কর্মশক্তিও হারিয়ে ফেলে। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার করলে এইডস, হেপাটাইসিস-সি , হেপাটাইসিস-বি সহ নানা ধরনের মরণব্যাধি বিস্তারের আশঙ্কা রয়েছে। তাই মাদকাসক্তিকে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। বস্তুত মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। জাতির অনাগত ভবিষ্যৎকেও মারাত্মকভাবে ধ্বংস করছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, মানবসৃষ্ট যে সকল সমস্যা বিশ্বের মানবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মাদক সমস্যা তারমধ্যে অন্যতম। এই সমস্যা কোনো দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি একটি সার্বজনীন সমস্যা। মাদকের অপব্যবহার ও মাদকের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যয় হচ্ছে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে, যা বিপন্ন করছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তাই এই সমস্যার মোকাবিলায় বিশ্ব সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দেশে মাদকের অপব্যবহার রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর মাদকবিরোধী প্রচারণা জোরদার করছে। এরমধ্যে মাদকবিরোধী পোস্টার, লিফলেট স্টিকার বিতরণ, আলোচনাসভা করা, কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতাও সুভেনিয়র প্রকাশনা ও বিতরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন এবং বুলেটিং প্রকাশ ও বিতরণসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, চলতি বছর থেকে মাদকের অপব্যবহার রোধে করণীয় বিষয় নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি ঢাকায় একটি ক্লাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে গোলটেবিল আলোচনা হয়। এছাড়াও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন খোঁজখবর নিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত আছে। এজন্য দেশের সকল বিভাগ ও জেলা এবং মেট্রো অঞ্চলে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদক আসতে না পারে তারজন্য বিজিবি ও নদীপথে কোস্টগার্ড অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আর ট্রেন, বাস, স্টিমার ও লঞ্চে যাতে মাদক আসতে না পারে তারজন্য মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও র‍্যাবসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলাবাহিনী

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। অভিযানের সময় হেরোইন, গাজা, কোকেন, গাজা গাছ, ফেনসিডিল, কোডিন মিশ্রিত খোলা ফেনসিডিল, ইয়াবা, রেকটিফাইড স্পিরিট, ইনজেকটিং ড্রাগস, প্যাথেডিনসহ নতুন নতুন মাদক উদ্ধার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আদালতের অনুমোদন নিয়ে এইসব মাদক ধ্বংস করার কার্যক্রম চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না।

অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মাদক একটি ভয়াবহ সমস্যা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্র এই দেশকে তাদের মাদক পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এই কারণে দেশে মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটছে। মাদকাসক্তির কারণে দেশের যুবসমাজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মাদকাসক্তদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক ও কিশোর। দেশের চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসসহ অধিকাংশ অপরাধের অন্যতম কারণ মাদকের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে, মাদক একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলাদেশ কোনো মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিকভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল (মিয়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড) ও গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান) বলয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে বাংলাদেশ মাদক সমস্যা হতে মুক্ত নয়। যুবসমাজের একাংশ মাদকের নীল দংশনে জর্জরিত। মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতি করার পাশাপাশি জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত রয়েছে সে পরিবারে দুঃখ-দুর্দশার শেষ নেই।

মাদক কর্মকর্তাদের মতে, মাদকাসক্তি বর্তমানে একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। মাদকাসক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতি করার পাশাপাশি তার জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। এই ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। যে যুবসমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার অথচ সেই যুবসমাজের একাংশ আজ মাদকাসক্তির করাল গ্রাসে জড়িয়ে পড়েছে। তারা মাদক সেবনে অর্থ উপার্জনের জন্য নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বিনষ্ট হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা, আর বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নের ধারা। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে মাদকের নীল নেশার কারণে বিপথগামী তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে হলে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে সৃষ্টি হবে একটি সুন্দর ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, মাদকের কারণে দেশের আইনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য এমনকি দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। বর্তমান সরকার মাদকের গ্রাস থেকে জাতিকে রক্ষা করতে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। একই সঙ্গে মাদকবিরোধী প্রচারণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। সুষ্ঠু, সুন্দর ও পারিবারিক পরিবেশে মা-বাবা আত্মীয়স্বজনদের দায়িত্বশীল আচরণ, যত্ন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে, বিশ্বে নানা ধরনের মাদক ব্যবহার করা হয়। এরমধ্যে বাংলাদেশে সাধারণত কোডিন (ফেনসিডিল), হেরোইন, গাজা, ইয়াবা, ড্রাগ অ্যাম্পল ইনজেকটিং, সিসা মাদক, প্যাথেডিন, আফিম, মরফিন, কোকেন, সানাগ্রা, ভায়াগ্রা, বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ওষুধসহ নানা ধরনের মাদকের ব্যবহার হচ্ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া এইসব মাদক ও ওষুধ সবই শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর অতিমাত্রায় সেবনের কারণে তা নেশা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কোনো কোনো ঘুমের ওষুধ উত্তেজনা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, গাজা এক ধরনের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশে গাজা গাছের পাতা ও ফুলের অগ্রভাগকে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর গন্ধ তীব্র। গাজা ধূমপানের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও হাশিশ, হাশ তৈল ও ভাং আছে। হাশিশ গাজা গাছের রস থেকে তৈরি করা হয়। কখনো কখনো একে চরসও বলা হয়। সরকার ১৯৮৪ সালে গাজার চাষ, বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

আর আফিম থেকে তৈরি হেরোইন একটি এ সময়ের শক্তিশালী মাদক দ্রব্য। এটা সাদা বা বাদামি পাউডার হিসেবে বিক্রি হয়। ধূমপানের মাধ্যমে হেরোইনের ধোয়া নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমেও এই বিপজ্জনক মাদকের অপব্যবহার করা হয়। অথচ এক সময় হেরোইন পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। হেরোইনের নেশাজনিত অপব্যবহার ছড়িয়ে পড়ায় একে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে, হেরোইন সেবনে ব্যথা, ক্ষুধা ও যৌন অনুভূতি কমিয়ে দেয়। রক্তচাপ ও শ্বাসপ্রশ্বাস হ্রাস পায়। ব্যবহারকারী ঘুম ঘুম ভাব, অচেতন ও ঠান্ডা অনুভব করতে পারে। অধিক মাত্রায় হেরোইন ব্যবহারের ফলে শরীরের নানা সমস্যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ইয়াবা প্রকৃতপক্ষে একটি বার্মিজ শব্দ। যার অর্থ হলো হর্স ড্রাগ বা ঘোড়ার ওষুধ। এটি নিউট্রোটক্সিন এবং সাইক্লোস্টিমুল্যান্ট (মানসিক উত্তেজক) বড়ি। যারা মনোযোগ আকর্ষণ জনিত রোগে ভুগে থাকে বা অবসাদগ্রস্ত তাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টির কাজেও এর অপব্যবহার হয়ে থাকে। রাসায়নিক যৌগ বিবেচনায় এর জটিল গুণাগুণ রয়েছে। এর পজিটিভ ও নেগেটিভ মিরর ইমেজ গুণাগুণ রয়েছে। বস্তুত পজিটিভ মিরর ইমেজ গুণসম্পন্ন ডেক্সট্রো মেথামফিটামিন বা অ্যামফিটামিনযুক্ত ড্রাগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় স্নায়ু-উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। এর সুনিয়ন্ত্রিত মান বজায় রেখে তৈরি করা ওষুধ আমেরিকায় খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন অনুমতি প্রদান করে থাকে। কিন্তু এর মান বজায় না থাকায় অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ মানবদেহের অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে বিধায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এর উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ নিজের আয়ত্তে রেখে ব্যবসা নিষিদ্ধ। কিন্তু এরপরও বাস্তবতা হলো এটি একটি সর্বনাশা নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতক ট্যাবলেটটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এটি ভারতে ভুলভুলিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াতে সাবু ও থাইল্যান্ডে চকালি নামে পরিচিত। এই মাদক গোলাকার ছোটো বড়ি। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাল রঙের হয়। তবে কমলা ও হালকা সবুজ রঙেরও হয়ে থাকে। ছোটো আকারের কারণে চোরাকারবারি বা অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বা অন্যান্য জিনিসের আড়ালে সহজে বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে পারে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হলেও ড্রাগ সেবনে ইয়াবার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। জানা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনীর মধ্যে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে ও শক্তিসামর্থ্য বজায় রাখতে এবং

দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে সক্ষম থাকতে ইয়াবার মূল উপাদান অ্যামপিটামিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কথিত আছে, এর কারণে জার্মান বাহিনীর কাছে সোভিয়েত রাশিয়ান বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু নেশার বড়ি হিসেবে এর ব্যবহার খুব বেশি পুরাতন নয়। ১৯৭০ বা '৮০-র দশক থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত থাইল্যান্ডের শ্রমিক ও গাড়ির চালকসহ অন্যান্য জনগণের মাঝে এর ব্যবহার শুরু হয়। এখন তা মহামারি আকার ধারণ করেছে। এক সময়ে থাইল্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ গাড়ি চালকদের ইয়াবা সেবন। পরবর্তীতে থাই সরকার ২০০৩ সালে থাইল্যান্ডে ইয়াবার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এছাড়াও থাই সরকার দেশের জনগণকে সর্বনাশা ইয়াবার কবল থেকে বাঁচাতে এবং এর নির্মূলে অত্যন্ত কঠোর হন। অভিযানে কুখ্যাত ইয়াবা ডিলারদের অনেকেই মারা গেছে। একইভাবে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী চীনের রাজ্যসমূহে ইয়াবা ব্যবহার শুরু হলে চীন সরকার এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। আর বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার সীমান্তবর্তী নাইক্ষ্যংছড়ির অদূরে মিয়ানমার অভ্যন্তরে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ইয়াবা তৈরির কারখানা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেসব কারখানায় উৎপাদিত অধিকাংশ ইয়াবা বাংলাদেশে চোরাই পথে পাচার হয়ে আসছে। থাইল্যান্ড ও চীনে ইয়াবা পাচার বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর মাদক পাচারকারীরা বাংলাদেশকে নিরাপদ হিসেবে বেছে নিয়েছে। মিয়ানমারে যে ইয়াবা ২৫-৩০ টাকায় বিক্রি হয় বাংলাদেশের টেকনাফে সেই ইয়াবা ৭০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়। কক্সবাজার-চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় পৌঁছলে তা ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়। এভাবে যেখানে যা পায় সেখানে সুযোগ বুঝে দাম উঠানামা করে। ইয়াবা নেশার কবলে পড়ে অনেক তরুণ-তরুণী তাদের জীবনীশক্তি হারিয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। যার কারণে বর্তমান সরকার ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাজা এবং অন্যান্য ঔষধি মাদক প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। এরপর মাদক ব্যবসায়ী ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের চিরুনি অভিযানে অনেক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে। এই-সব মাদক প্রতিরোধে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সহায়তায় প্রতিদিন মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এরপরও মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা, টেকনাফ ও নাফ নদীসহ বিভিন্ন পথে নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা পাচার করে আনা হচ্ছে। আর নেশাগ্রস্তরা নানা উপায়ে ইয়াবা সংগ্রহ করে তা সেবন করছে।

বর্তমান সরকার মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মাদক নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলেছে এবং এর তথ্য প্রকাশ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকার তেজগাঁও-এ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে যাদের অবস্থা ভালো না তাদেরকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবার অনেককে পরিবারের তত্ত্বাবধানে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে দেশের সকল বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আর বহু স্থানে মাদকাসক্তদের জন্য প্রাইভেট চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ ঠেকাতে ও ওষুধসহ অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য মাদকের আমদানি, পরিবহণ, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছে। মাদকের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে মাদকবিরোধী পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, মাদকবিরোধী স্টিকার লাগানো, কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন ও বক্তব্য তুলে ধরার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন তথ্য সংগ্রহ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা দায়ের করে আসামির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেওয়া ও বিচার কাজে সহায়তা করা হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মাদক ও মাদক জাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্ট করা, একই সঙ্গে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ডাটাবেজ সংরক্ষণ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারা দেশের মাদক কেনাবেচার বিপজ্জনক স্পটগুলো চিহ্নিত করে সেইসব স্পটে অভিযান পরিচালনা করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে বলে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক তথ্যে জানা গেছে, মানুষের বিবেক, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে পারিবারিক,সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পর্যায়ের মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা নিরলসভাবে কাজ করছে। তারা মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম , কর্মশালা, মতবিনিময়, মাইকিং করাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করছে। এছাড়াও ৭০টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছে। তারাও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৭ সালে পৃথিবীকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবছর ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও মাদক পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তখন থেকে বিশ্বের প্রতিটি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেস্থেসিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনসেনটিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. দেবব্রত বণিক বলেন, হেরোইন, মরফিন, প্যাথেডিনসহ নেশা জাতীয় যত ধরনের মাদক আছে তা সেবন করলে সেবনকারীর (যুবক, তরুণ বা তরুণী) শরীরে কার্যক্রম মাদকে আসক্ত হয়। এরপর সেই ব্যক্তি মাদক সেবন না করলে তার মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অস্থিরতার সময় নানা ধরনের অপরাধ করতে পারে। তার মধ্যে চিন্তাশক্তি লোপ পায়। সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে না। যার কারণে নিজের বাবা-মার ওপর আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। পুরো শরীরের কার্যক্রম মাদকের ওপর নির্ভর করে। কেউ বন্ধুদের পাল্লায় বা খপ্পরে পড়ে ১ থেকে ২ বার মাদক নিলে আবার নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। তখন তার শরীরে কোনো ওষুধ কার্যকরী নয়। এইসব কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা ঠিক নয়। নেশা জাতীয় ওষুধ বা মাদকের ব্যবহার করলে সামাজিকভাবে তার অবক্ষয় হবেই।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন

শামসুজ্জামান শামস

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। তবে দেশে বিশাল জনসংখ্যার একটি অংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব এখনো বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা না গেলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে তা লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে সঠিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক সংগঠন। দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের পরীক্ষিত ব্যবস্থা সমবায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই সমবায় প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে কৃষিসহ অন্যান্য সেক্টরের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে সমবায় প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের নিরন্তর প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে প্রবহমান। সেই অর্থে সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কেননা দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজে বাস করে না, সে হয় দেবতা না হয় পশু'। সমবায়ে কেউ তার নিজের জন্যই শুধু নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য। এ কারণেই সমবায় অভাব ও দারিদ্র্য ঘোচানোসহ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সৃষ্টিতে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে খ্যাত। দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের মুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে সমবায়। বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তসম্পন্ন মানুষদেরকে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে জার্মানির রাইফিজেন মডেলে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি গঠিত হয় মূলত ব্রিটিশ অফিসার নিকোলসন-এর উদ্যোগে। ১৯০৪ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের জেনারেল লর্ড কার্জন সমবায় ঋণ দান সমিতি আইন জারি করেন। মূলত এই আইনের মাধ্যমেই উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ 'দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট' নামে সমবায় আইন পাস করে। এই আইন ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বলবৎ থাকে। সমবায় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে জারি করা হয় সমবায় অধ্যাদেশ। ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয় সমবায় নিয়মাবলি। ১৯৮৯ সালে প্রণীত হয় সমবায় নীতিমালা। ২০০১ সালে জারি করা হয় সমবায় সমিতি আইন। ২০০৪ সালে প্রণীত হয় সমবায় বিধিমালা ।

সমবায়ী সংগঠনগুলোর মূল কাজ অর্থনৈতিক হলেও এর মাধ্যমে সমাজের অন্য কল্যাণও সাধিত হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সহমর্মিতা, মানবিকতা ইত্যাদির চর্চা বেড়েছে, মানুষ ও সমাজ উপকৃত হয়েছে। সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। এই মূলনীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, মাদক প্রতিরোধ, বয়স্ক পুনর্বাসন, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, বাল্যবিয়ে, বহু বিয়ে রোধ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের সমবায় সংগঠনগুলোর সদস্যদের কর্মদক্ষতা ও পুঁজি বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগ কার্যক্রমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ নভেম্বর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪' বিতরণ করেন –পিআইডি

অর্থনীতি হচ্ছে উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল। পশ্চিমা বিশ্বে উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সচেতন মানুষও দিন দিন অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এখন তারা বুঝতে পারছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন গুণে, মানে ও পরিমাণে উদ্যোক্তা সৃষ্টি। শুধু একজন উৎসাহী উদ্যোক্তাই পারে একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদ, শ্রম, প্রযুক্তি ও পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে। উদ্যোক্তারাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নায়ক। উদ্যোক্তারা স্বপ্ন রচনা করেন এবং নিজ ক্ষমতায় তা বাস্তবায়ন করেন। তাদের স্বপ্নের সংগঠিত রূপ হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত। একটি সমৃদ্ধিমান ও বিকাশোন্মুখ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুত বর্ধনশীল ও বিকশিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত (এসএমই)। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আজকের অনেক বৃহৎ উদ্যোক্তাই একসময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। শ্রমঘন উৎপাদন প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগে আয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে

দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছেন। প্রতি বছর দেশের কারিগরি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটগুলো থেকে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, প্রকৌশল, লেদার, টেক্সটাইল, সিরামিক টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে হাজার হাজার যুবক বের হয়। তাদের সামান্য একটি অংশ চাকরি পেলেও বাকিরা অভিশপ্ত বেকার জীবনযাপন করে। কেউ কেউ মনের দুঃখে ছোটোখাটো চাকরির আশায় দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমায়। তাদের কারিগরি শিক্ষা সমাজ ও দেশের কোনো কাজেই লাগে না। এ অবস্থার অবসানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন উদ্যোক্তারা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে স্ব-উদ্যোক্তা হয়ে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটানো সম্ভব। শিক্ষা সমাপনের পর চাকরির জন্য এখানে সেখানে লোকজনকে ধরা শিক্ষিত লোকজনের জন্য অবমাননাকর। আমরা চাই না আমাদের যুবসমাজ তাদের চাকরির জন্য এখানে-সেখানে ঘুরাফেরা করুক। অন্যের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমাদের যুবসমাজ স্ব-উদ্যোক্তায় পরিণত হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করুক। এতে করে উদ্যোক্তা যেমন লাভবান হচ্ছে তেমন দেশও উপকৃত হচ্ছে। উদ্যোক্তা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই রচনা করবেন বলে দৃঢ় সংকল্প করেন এবং যিনি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হতে চান একজন স্বাধীন পেশাজীবী। কেউ কেউ বলেন, তারা হচ্ছেন সংগঠক। তিনি কাজ করেন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ক, সংগঠক এবং পরিদর্শকরূপে। তিনি একজনের জমি, অন্যজনের শ্রম এবং আরেকজনের পুঁজিকে একত্র করে পণ্য উৎপাদন করেন। বাজারে সেই পণ্য বিক্রি করে মূলধনের সুদ, জমির ভাড়া, শ্রমিকের মজুরি দিয়ে যা পান তাই তার লাভ। কেউ কেউ বলেন, এরা নব ধারার প্রবর্তক। কারণ তারা নতুন ধরনের পণ্য বাজারে প্রবর্তন করেন, নতুন প্রযুক্তির প্রথম প্রয়োগ করেন এবং কোনো পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করেন। অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে পৃথক এক গতিময় উৎপাদন উপাদানের নতুন বিন্যাস।

দেশের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পুরোটাই নারীদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক প্রান্তিক পর্যায়ের প্রায় আড়াই কোটি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র নারীরা। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে নারীরা যেমন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, তেমনি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সর্বশেষ হিসাবে দেশে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এরমধ্যে ৯০ শতাংশই নারী গ্রাহক। এসব গ্রাহকের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তুলেছেন। এতে আয় বাড়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে। যা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে করেছে গতিশীল।

শহরের পাশাপাশি গ্রামেও বাড়ছে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা যায়, গত ৪ বছরে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে ২১৫ দশমিক ১০ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম বিভাগ চালু করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে নারীসহ অন্যান্য উদ্যোক্তা তৈরিই এর উদ্দেশ্য। ২০১০ সালের ডিসেম্বর শেষে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ২৪০ জনে। ডিসেম্বরের ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮৯ হাজার ১৮ জন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়– সেবা, ব্যবসা এবং শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়। ২০১০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ খাত তিনটিতে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ১ হাজার ৮০৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর শেষে ঋণ বিতরণ করা হয় ৯ হাজার ৪২৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। সে হিসাবে বিগত ৪ বছরে এসএমই'তে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বেড়েছে ৮৫ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাকে নারীকর্মীর অবদান পুরুষের চেয়েও বেশি। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণের মতো দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত আবর্তিত হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের কেন্দ্র করে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও বাড়ছে নারীদের অবদান। এছাড়া ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতির মতো সরাসরি আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে নারীদের ক্রমেই অংশগ্রহণ বেড়ে চলছে। এমনকি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগেও পিছিয়ে নেই নারীসমাজ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন সাড়ে ৩ লাখ যুবক। অন্যদিকে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১২ সালের এক গবেষণার তথ্য মতে, দেশে প্রতিবছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু কাজ পায় মাত্র ৭ লাখ। এরমধ্যে উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যারা শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন তারাও আছেন। পরিসংখ্যান বলছে, এদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করেন, বাকিরা থাকেন বেকার। বিশ্বব্যাংক মনে করে, বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। এর ওপর এখন প্রতিবছর ১৩ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে যোগ হচ্ছে। তাই নতুন কর্মসংস্থান তৈরির তীব্র চাপ রয়েছে অর্থনীতির ওপর। সংস্থাটির মতে, কর্মসংস্থান ২ শতাংশ বাড়ানো গেলে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে বৃদ্ধি করে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব। উদ্যোক্তাদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের তত বেশি সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই তরুণ। এই তরুণদেরকে সমাজের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারলে, দেশের অর্থনৈতিক চেহারাই বদলে যাবে। উদ্যোক্তারা যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চালিকাশক্তি। উন্নত দেশের সফলতার ইতিহাস মূলত সৃষ্টিশীল উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকারই ইতিহাস। উদ্যোক্তারা দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করেন। মূলধন ও দক্ষতাকে গতিময়তা দান করেন। জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করে তুলেন, প্রাপ্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটান, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। উন্নত পণ্য ও সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। তাই পরিশেষে বলা যায়, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ৫ নভেম্বর সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গার নেতৃত্বে একটি সমবায় র‍্যালি বের হয় –পিআইডি

লেখক: কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক

নিবন্ধ

উন্নয়নে জেন্ডার সমতা

সৈয়দ শাহরিয়ার

জেন্ডার সচেতনতা আসলে নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয় এবং গত শতাব্দীর আশির দশকে তা প্রতিষ্ঠা পায়। জাতিসংঘে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনে জেন্ডার সমতাকে উন্নয়নের মূলধারার সূচক হিসেবে গ্রহণ করে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমতার ভাবনাটি বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলনের পরেই বিশ্বে দ্রুত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে।

কন্যাশিশু ও কিশোরীদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জিত হবার পথে। সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪ জন কিশোর-কিশোরী। সেই অনুসারে দেশে কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা ১ কোটি ৩৮ লক্ষ। এরমধ্যে প্রায় অর্ধেক মেয়ে। এই তথ্য পরিসংখ্যান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (C.E.D.A.W) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মূলত নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি কৌশলের আলোকে প্রণীত হয়েছে এ নীতি। এই নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আজ সময়ের দাবি। আজকের কন্যা আগামীর নারী। তাই কন্যাশিশু বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে বর্তমান সরকার। কন্যাশিশুর জন্যে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পদক্ষেপ– শিক্ষা পাঠক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা, নারীকে পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সেলক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, শুধু সেসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা, প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

বর্তমান সরকার নারী উন্নয়নের ও জেন্ডার সমতা আনয়নে শিক্ষার ওপর অগ্রধিকার দিয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া এমনি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নারী উন্নয়নের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭১,৮৭২ কোটি টাকা। অথচ ২০০৯-১০ অর্থবছরে নারী উন্নয়নে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭,২৪৮ কোটি টাকা। নারী উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দই প্রমাণ করে বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। লক্ষণীয় যে, ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ মোট পাঁচটি অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন বরাদ্দ হয়েছে ৯২,৭৬৫কোটি টাকা, যা মোট বাজেট বরাদ্দের ২৭.৪ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৪.৭৩ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রতিবেদনে চল্লিশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারী উন্নয়ন ও নারী অগ্রগতির বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত মোট ৪০টি মন্ত্রণালয় বিভাগকে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রমবাজার ও আয় বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ, সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রণীত নীতিসমূহের সাথে নারী উন্নয়নের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়গুলো কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে জেন্ডার বৈষম্য চিহ্নিতকরণ এবং সেলক্ষ্যে কিছু কার্যক্রমকে নারীবান্ধব করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকার নিয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নারীর কর্মসংস্থান ৭০ লাখ থেকে ১ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছেছে। প্রায় ৪০ লাখ নারী আজ পোশাকশিল্পে কাজ করছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ নারী দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাচ্ছে–এটি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন।

বাংলাদেশের প্রবহমান নদনদী

সাইয়েদা ফাতিমা

নদনদী বাংলার প্রাণ। হাজার বছর ধরে বয়ে চলা নদীর পলি দ্বারা গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ নামক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপটি। আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিল্প সভ্যতা ও জীবন-জীবিকায় তাই নদনদীর অপরিসীম প্রভাব, নদীর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আমাদের অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। কৃত্রিম কিংবা প্রাকৃতিক কারণে নদী কখনো পরিবর্তন করেছে তার গতিপথ। এক সময়ের ক্ষীণকায় পদ্মার বিশাল রূপ, প্রমত্তা ব্রহ্মপুত্র নদ যমুনার শাখা নদীতে রূপান্তর, করতোয়া কিংবা ভৈরবের রূপ পরিবর্তন, পূর্বের খরস্রোতা যমুনার বর্তমান ক্ষীণধারা, সবাই যেন কালের নীরব সাক্ষী।

দশম শতকের জনৈক কালি ভুসুক চর্যাপদে পদ্মা নদীকে 'পাউয়া খাল' বলে উল্লেখ করেন। কালক্রমে পদ্মা বিশাল নদীতে পরিণত হয়। পৃথিবীতে নদনদীর ইতিহাস বড়োই বিচিত্র। নতুন জন্ম নেওয়া জলাধা কখনো নব কলেবরে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আবার কালের গর্ভে কোনো কোনো নদী হারিয়ে যায়। নদীর ধর্মই একূল ভাঙা ওকূল গড়া। ভাঙা-গড়ার মাঝেই নদী আমাদের প্রাত্যহিক জীবন কৌতূহল উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

এক সময় করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রাই, তিস্তা ও মহানন্দা বিশাল নদী ছিল। ভূ-আন্দোলন নদনদীর আয়তন ও আকৃতির বদল ঘটায়। যমুনার গতিপথের পরিবর্তনের ফলে পদ্মার শাখা নদী, তিস্তা, করতোয়া এবং আত্রাইয়ের গতিপথের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন সময়ের জরিপ ও মানচিত্রে বাংলাদেশের নদনদীর অবস্থান ও প্রবাহ খাত সম্পর্কে জানা যায়। করতোয়া ছিল তিস্তা নদীর শাখা নদী। ১৮২০ সালে করতোয়া তার গতিপথ পরিবর্তন করে।

১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরবঙ্গের ভয়ংকর বন্যায় করতোয়ার সাথে তিস্তার বিচ্ছেদ ঘটে। হিমালয়ের উত্থানের সাথে তিব্বত সাগর হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস জড়িত। ব্রহ্মপুত্র নদ ও সিন্ধু নদ এই উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান ছিল। বর্তমানে সিন্ধু নদ দক্ষিণ–পশ্চিম মুখ করে পতিত হচ্ছে। এই নদ এক সময় উত্তর-পূর্ব মুখ করে তিব্বত সাগরে পতিত হতো। বর্তমানে হয় বঙ্গোপসাগরে। ইছামতি নদীও এক সময় তিব্বত সাগরে পতিত হতো।

বিশাল নদীর ধারা হঠাৎ পরিবর্তিত হলে বিস্মিত হতে পারে কেউ। তবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। গঙ্গা নদী (শিবু-শিবলিক নদী) পতিত হতো আরব সাগরে। বর্তমানে পতিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন হবার ফলে সুরমা ও কুশিয়ারা যৌথ ভাবে মেঘনা নদে প্রবাহিত হতো। পদ্মা, মেঘনা নদীও চাঁদপুরের কাছে মিলিত না হয়ে, এক সময় দুটি আলাদা স্রোতধারায় সাগরে পতিত হতো। নদী বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ভাঙনরত যমুনা নদী হয়ত প্রকৃতির নিয়মেই গঙ্গা নদীতে মিশে যাবে। তখন হয়ত পশ্চিমে যমুনা নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৭শ শতকের উত্তর বঙ্গের বন্যা, নদীপথের পরিবর্তনের বিশাল ভূমিকা রাখে। ভূ-আন্দোলনের ফলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। এসব পাহাড়সমূহের ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানির প্রবাহ থেকে সৃষ্টি হয় অনেক নদীর। তাই চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীসমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলোর তুলনায় নবীন।

মূল নদনদী থেকে প্রবাহিত শাখা ও উপনদীগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোনো কোনো বড়ো নদীর অনেকগুলো শাখানদী ও উপনদী রয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব মতে, ৪০৫টি নদনদী বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন এ সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। শত বছরের বহু নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ফলে নৌপথের পরিবর্তন হয়েছে।

রেনেলের মানচিত্র অনুসারে (১৭৭৬ সাল) ব্রহ্মপুত্র নদ মধুপুর গড়ের পূর্বদিকে প্রবাহিত হতো। গঙ্গা আরিচার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে আড়িয়াল খাঁ নদের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। বর্তমানে গড়াই বা মাথাভাঙ্গা নদীর অস্তিত্ব তেমন প্রবলভাবে লক্ষ করা না গেলেও জলংগী বা চন্দনা নদী, শাখানদী হিসেবে বেশ প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল। তাসিনের মানচিত্রে (১৮৪০ সাল) লক্ষ করা যায় ব্রহ্মপুত্র তার উজাড় করা প্রবাহ নিয়ে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। এই প্রবাহ কীর্তিনাশা নদী দিয়ে চাঁদপুরের মেঘনার সাথে মিলিত হয়। এই মানচিত্রে ফেনী ও চিংড়ি দুটি আলাদা নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিতাস নদীটি মেঘনা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। তিতাস মেঘনার শাখানদী আবার উৎসমুখ ও পতিত মুখ এক নদীতে হওয়ায় তিতাস মেঘনার একটি আন্তঃশাখা নদী। এ নদীটির আবার উপনদী– সোনাই, লহর, হাওড়া ও বিজলী। সোনালিয়া ও মুহূরী নদী দুটি সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে

ফেনী নদীতে পতিত হয়েছে। সেদিক থেকে ফেনীর উপনদী এ দুটি নদী। সোনালিয়া, মুহূরী ও ফেনী এই তিনটি নদীর বিশাল প্রবাহ ফেনী নামেই মেঘনার মোহনায় পতিত হচ্ছে।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে বয়ে চলা নদীসমূহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা ও যমুনা নদীসহ এই অঞ্চলে রয়েছে ছোটো-বড়ো ১১৫টি নদী। আত্রাই, ধরলা, দুধকুমার, করতোয়া, মহানন্দা ও বাঙালি উল্লেখযোগ্য নদী। রংপুর বিভাগ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ঢালু হওয়ায় কিছু নদী তিস্তার দিকে কিছু নদী যমুনার দিকে প্রবাহিত। রাজশাহী অঞ্চলে ভূমি উঁচুতে হওয়ায় এই অঞ্চলের নদীসমূহ গঙ্গা/পদ্মা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদীর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চলের নদনদীর গতিপ্রকৃতি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নদনদী থেকে আলাদা। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি আলাদা। তবে শত বছরে এ অঞ্চলের নদনদীর তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হওয়া নদীগুলো উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এ অঞ্চলে রয়েছে ১৬টি নদী। এ অঞ্চলের বেশকিছু নদী স্বাধীন। এ নদীর রয়েছে নিজস্ব অববাহিকা। নদীগুলো অন্য কোনো নদীতে পতিত না হয়ে সরাসরি সাগরে পতিত হয়েছে। এ অঞ্চলের নদী হালদা, নদীটি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদী আবার স্বাধীন নদী। নদীটি পাহাড়ি উপত্যকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। সাঙ্গু ও মাতামুহূরী নদী দক্ষিণ হতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। ফেনী, কর্ণফুলী, হালদাসহ বেশকিছু নদী গতিপথে গঠিত হয়েছে প্লাবনভূমি। পাহাড়ি ঢল থেকে এ অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা সংগঠিত হয়।

২০টি সীমান্ত সংলগ্ন নদীসহ ৮৭টি নদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অঞ্চলটি বছরে ছয়-সাত মাস পর্যন্ত পানিতে নিমজ্জিত থাকে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদী এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত শোমেশ্বরী ও কংশ নদী উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। এ অঞ্চলে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা জুরি, মনু, লংলা ও খোয়াই নদী দক্ষিণ-উত্তরে প্রবাহিত হয়ে কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের সব নদীই উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

যাদুকাটা, জলুখালী, উমিয়াম, পিয়াইন ও সারিগোয়াইন সীমান্ত সংলগ্ন নদী। এই নদীগুলো উত্তরের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা নদীতে পতিত হয়েছে। ভারত থেকে আগত বরাক নদটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি ধারা সুরমা নামে পশ্চিমে অপরটি কুশিয়ারা নামে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা ও কুশিয়ারা বিভিন্ন সময় তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা দুই দিকে প্রবাহিত হলেও কালনী-কুশিয়ারা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে ভাটিতে সুরমা-বাউলাই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। মিলিত ধারাটি আবার মনু নদীতে গিয়ে মিশেছে।

উত্তর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রয়েছে ৬১টি নদী। বৃহত্তম ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। মধুপুর গড়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে বংশী নদী। নদীটি ধলেশ্বরী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। বানার নদী বয়ে গেছে গড়ের পূর্বাংশ দিয়ে এবং মিলিত হয়েছে শীতলক্ষ্যা নদীতে।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র তার গতি পরিবর্তন করলে যমুনা নদীর উত্থান ঘটে। ধলেশ্বরী যমুনার শাখানদী। গত ১০ হাজার বছরে গঙ্গা বিভিন্ন সময়ে তার মূল প্রবাহ এবং শাখানদীসমূহের প্রবাহপথ পরিবর্তন করেছে। ২/৩ হাজার বছর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ মধুপুর গড়ের পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হতো। ব্রহ্মপুত্র নদের পরিবর্তনের সাথে দেশের অন্যান্য নদনদীর গতি পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র অনুসারে ব্রহ্মপুত্র নদ গড়ের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ বিশাল কলেবরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরী থেকে উৎপত্তি হয়ে ফতুল্লার কাছে ভাটিতে আবার ধলেশ্বরী নদীতে মিলিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ের নদনদীর মানচিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়– বংশী ও ঝিনাই নদী বুড়িগঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরী নদীর সাথে মিলিত হতো। এক সময় ধলেশ্বরী বিশাল নদী ছিল। বংশী নদীর উৎপত্তি ঝিনাই নদী থেকে। নদীটি সাভারের কাছে ধলেশ্বরী নদীতে পতিত হয়।

পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র–যমুনা নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী উত্তর-পূর্ব দিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এবং দক্ষিণ–পূর্ব দিকে মেঘনা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত উত্তর কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এ অঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, কালীগঙ্গা, বংশী, তুরাগ ও বালু নদী উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ঢালু। অধিকাংশ নদী ব্রহ্মপুত্র–যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে উৎপত্তি হয় এবং নদীসমূহ পদ্মা ও মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। এক সময় ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যমুনা নদীতে পতিত হবার ফলে যমুনা বিশাল আকার ধারণ করে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র মেঘনা (আপার) নদীতে পতিত হতো। গতি পরিবর্তন হওয়ার ফলে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যমুনা নদীতে পতিত হয়। ফলে প্রাচীন গতিপথ ক্ষীণকায় হতে হতে প্রায় মরে যায়। প্রাকৃতিকভাবে কিংবা কৃত্রিমভাবে যেভাবেই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হোক না কেন; নৌপথ নদীর গতি পরিবর্তনে ওপর সিংহভাগ নির্ভরশীল।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন নদী তীরবর্তী মানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তন কতটা প্রাকৃতিক কতকটা মানবসৃষ্ট। এর শুভ এবং অশুভ দিক রয়েছে।

বৈচিত্র্যময় শীত ঋতু

অসিত কুমার ম-ল

ঋতু বৈচিত্র্যের ক্রমবিবর্তনের ধারা আবর্তিত বাংলার প্রকৃতি। এক রূপ থেকে আরেক রূপে আবর্তনের এই ধারাকে বলা হয় ঋতু পরিবর্তন। এ পরিবর্তন আবহমান কালের। প্রকৃতি রূপ বদলের চাকায় ঘুরে ঘুরে এক এক রূপে এসে হাজির হয় আমাদের সামনে। সে রূপের সৌন্দর্য এক এক রকম। সেই মোহনীয় রূপে সজ্জিত হয়ে বাংলার প্রকৃতি নতুন নতুন নাম ধারণ করে। এভাবে ছয়টি নামে বাংলার ঋতু পরিবর্তনকে অভিহিত করা হয়েছে। তাই আমাদের এদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বলা হয়। আর এই ষড়ঋতুর মধ্যে শীত ঋতু বা শীতকাল একটি। প্রতিবছর এ ঋতু একবার ফিরে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। মানুষের মনে দাগ কেটে যায় আর চুপি চুপি এসে কানের কাছে যেন বলে–

আমি এসেছি হে মানুষ
তোমাদের প্রত্যেকের দ্বারে,
বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে।

কৃষকের কাস্তের ফলায়
সোনালি ধানের মাঠে,
শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জের হাটে।

নতুন ধানের গন্ধ–ভরা উঠোনে
নবান্নের উৎসবে মেতে,
সবুজ-শ্যামল, সবজির ক্ষেতে।

পিঠাপুলি আর পায়েশের ধুমে
খেজুর রসের সুবাসিত ঘ্রাণে,
কৃষক বধূর উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

এসেছি উত্তরী হিমেল হাওয়ায়
কনকনে শৈতপ্রবাহ দিতে,
তোমাদের ভাঙা কুঠুরিতে।

শীতের আগমনে গ্রামবাংলা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। মাঠে মাঠে সোনালি ধান আর ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজ শাকসবজি যেমন– লাল শাক, পালং শাক, ঘৃতকাঞ্চন, ওলকপি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিটকপি, মূলা, গাঁজর, টমেটোসহ নানানরকম শাকসবজি আর ফল-ফলাদিতে গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়ি রমরম করে। খালে-বিলে কৈ, মাগুর, শৈল, টাকি, পাবদা, পুঁটিসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমারোহ গ্রাম্য জনজীবনে এক স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেয়। কৃষকের ঘরে ঘরে উঠোনে উঠোনে ধানে ভরে যায়। কৃষাণ বধূরা সেই ধান রৌদ্রে শুকিয়ে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানে। আতপ চাউল গুড়া করে। সেই চাউলের গুঁড়া দিয়ে নানান রকম পিঠা তৈরিতে বসে যায়। এসব পিঠার মধ্যে তেলের পিঠা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা অন্যতম। চিতই পিঠা খেজুর রসে ভিজিয়ে খেতে ভারি মজা। শীতের সকালে গাছি (যিনি খেজুর গাছ কাটেন) যখন খেজুর গাছ থেকে টাটকা খেজুর রসের 'ঠিলে' নামিয়ে নিয়ে আসে, তখন ছেলেমেয়েরা গরম চিতই পিঠা নিয়ে থালা-বাটিতে খেজুর রস নিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে যে কী আনন্দ উপভোগ করে তা না দেখলে কখনো উপলব্ধি করা যাবে না।

বাড়িতে বাড়িতে নতুন চাউলের মুড়ি ভাজার ধুম পড়ে যায়। উত্তরবঙ্গে এই মুড়িকে আঞ্চলিক ভাষায় অনেকে 'হুড়ুম' বলে থাকেন। শীতের সকালে খেজুর রসের তৈরি 'নলেন পাটালি' (খেজুর রসের তৈরি নতুন গুড়) নিয়ে হুড়ুম খেতে বসে যান অনেকে। অনেক বাড়িতে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে পিঠা-পায়েশ তৈরির সাথে ঢেঁকি পেতে চিড়া কোটার ধুম পড়ে যায়। চিড়া কোটার সময় নারীরা দলবেঁধে লোক সুরে গান গায়–

চিড়াকুটি চিড়াকুটি বকুল গাছের তলাতে
ও দিদি কুটুম আইসাছে বাড়িতে ॥

বড়ো বউ চিড়া কোটে ঝুমঝুম গাছের তলে
আর মেজো বউ চিড়া কোটে ধাপুস ধুপুস করে।
ওরে ঢেকুস কুসকুস বাজনা বাজে
ঢেঁকিতে কী বুকেতে ॥

নোয়া বউ চিড়া কোটে হলুদ গায়ে দিয়ে
আর ছোটো বউয়ের মানজার বিছা ঝুমঝুম করে বাজে।
আরে ঠুন ঠুন ঠুন চুড়ির তালে বউ
ঢইল্যা পড়ে আড়িতে ॥

শুধু গ্রামবাংলায় নয়। শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে অসচ্ছল পরিবারের নারীরা দুটো পয়সা রোজগারের তাগিদে তোলা চুলা পেতে ফুটপাতে বসে তেলের পিঠা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠাসহ নানান রকমের পিঠাপুলি বানিয়ে বিক্রি করে। এমনকি শহরের অনেক সচ্ছল পরিবারের নারীরা বাড়িতে বসে নানান রকমের পিঠা তৈরি করে পরিবারের সবাই একসাথে মিলে মজা করে পিঠা খাওয়ার উৎসবে মেতে ওঠে। কখনো বা খেজুর গাছ কাটারি ঠিলে ভরে রস নিয়ে বাঁকে করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে শহরের ঘরের দরোজায় গিয়ে হাজির হয়। অনেক সময় দেখা যায় গ্রামবাংলার বিভিন্ন হাটবাজারে ঘোষের দোকানিরা ছোটো ছোটো ভাঁড়ে বা টাটিতে দই পাতিয়ে ঝুড়িতে সাজিয়ে বাঁকের দুই মাথায় জালের ভিতরে ঢুকিয়ে ঘাড়ে করে ঝুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে দই নেবে? দই? ভালো দই। গ্রামবাংলার পথে পথে এ দৃশ্য দেখতে ভারি সুন্দর। আর অনেক ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দইওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হয়। দই কেনার জন্য বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরে বসে। এ যেন গ্রামবাংলার এক চিরায়ত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

কৃষকের ঘরের চালায় গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পুঁইশাক দেখতে পাওয়া যায়। কথায় বলে– 'শাকের রাজা পুঁই আর মাছের রাজা রুই' খেতে দারুণ মজা। শীতকালে পুঁইশাকে ডিম ছাড়ে অর্থাৎ পুঁইশাকের গাছে ফল আসে। পুঁইশাকের এই ফল অপরিপক্ক অবস্থায় দেখতে খুব সুন্দর এবং রান্না করা বিশেষ করে চিংড়ি, কৈ, শৈল, টাকি মাছ দিয়ে ভাজা বা কালিয়া খেতে খুব সুস্বাদু। শুধু পুঁই শাক নয়। গ্রামবাংলার প্রায়ই বাড়িতে লাউগাছের সমাহার লক্ষ করা যায়। অনেক বাড়ির উঠানে বা ঘরের আঙিনায় বড়ো ফাঁস বিশিষ্ট জাল বিছিয়ে ঐ জাল উঁচু করে টানিয়ে তার উপরে লাউ গাছ লাগাতে দেখা যায়। আর এই লাউ গাছে লাউ ধরার পরে জালের ফাঁক দিয়ে যখন নিচে ঝুলে পড়ে তখন তা দেখতে চমৎকার লাগে। এভাবে শহরের অনেক বাড়িতেও আজকাল লাউ গাছ লাগাতে দেখা যায়। আর লকলকে এই লাউয়ের ডগা দেখলেই মনে পড়ে যায়–

সাধের লাউ বানাইছে মোরে বৈরাগী
লাউয়ের আগা খাইলাম-গোড়াও খাইলাম
লাউ দিয়ে বানাইলাম ডুগডুগি।

সত্যিই লাউ পাকলে লাউয়ের খোল বা 'বস' দিয়ে চামড়া লাগিয়ে 'ডুগডুগি' বা ডমরু বানালে তাতে ভারি চমৎকার মিষ্টি সুর ধ্বনিত হয়। শুধু তাই নয়। পাকা লাউয়ের খোল দিয়ে বানানো একতারার কোনো বিকল্প নেই। লাউয়ের খোলের একতারা সবচেয়ে সুন্দর মিহি এবং মিষ্টি সুরে বাজে। অধিকাংশ বাউলেরা লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি একতারা বাজাতে বেশি পছন্দ করেন। যে একতারা বাঙালি সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে।

মাঠের ধান কাটা যখন শেষ হয়ে আসে এবং বিলের সমস্ত পানি যখন খালে গিয়ে জমে এবং খালের পানিও কমে আসে। তখন গ্রামের যুবকরা মিলে বেলা দশটা-এগারোটার সময় যখন সূর্যতাপ প্রখর হয়। ঠিক তখন 'প্লো' (বাঁশের চিকন শাল দিয়ে তৈরি, নিচের মাথা প্রশস্ত এবং উপরের অংশ সরু নিয়ে মাছ শিকারে বেরিয়ে পড়ে এবং নানারকম দেশি স্বাদু পানির মাছ ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসার পর যে কি আনন্দ! সেটি লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।

শীত মৌসুমে নদীতে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য উল্লেখ করার মতো। নদীতে জোয়ার আসার আগে জেলেরা নদীর চরে কিছু দূর অন্তর অন্তর লগি পুঁতে বড়ো লম্বা পাটা জাল টানিয়ে জালের নিচের প্রান্ত মাটিতে পুঁতে উপরের প্রান্ত লগির উপরের দিকে লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। নদীতে জোয়ার পূর্ণ হলে রশি টেনে জালের উপরের প্রান্ত উঁচু করে লগির উঁচু মাথার সাথে শক্ত করে বাঁধা হয়। ভাটা হয়ে যখন নদীর চর জেগে যায়; তখন দেখা যায় নানারকম সামুদ্রিক মাছ জালের নিচের প্রান্তে আটকে আছে। জেলেরা এ সকল মাছ ঝুড়ি এবং ডালা ভরে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে।

শীতের দিনে জেলেদের মাছ ধরার আরো একটি অভিনব কৌশল সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করে। তা হলো, অনেক

জেলেরা তাদের নৌকার গলুইয়ে (নৌকার সামনের মাথা) খাঁচার ভিতরে বেজি আকৃতির এক প্রকার প্রাণী। তবে বেজির চেয়ে দৈহিক গঠনে এরা অনেকটা বড়ো। গ্রামীণ ভাষায় এদেরকে 'ধেড়ে' বলা হয়। পানির ভিতরে এরা মাছ খুঁজে তাড়িয়ে আনতে পারে এবং ধরতে পারে। এ জাতীয় প্রাণীকে পোষ মানিয়ে নদীর জলে নামিয়ে দিয়ে মাছ তাড়িয়ে ধরে আনার দৃশ্য এক অন্যরকম বিরল আনন্দের উন্মাদনা দান করে। যারা এ মজাদার বিষয়টি দেখেননি তারা হয়ত এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ঋতুচক্র বা মাস গণনায় ভাদ্র এবং আশ্বিন দু'মাস শরৎকাল। আর কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ দু'মাস হেমন্তকাল। কিন্তু শরৎকাল বিদায় নেওয়ার সাথে সাথেই হালকা-পাতলা শীতের আভাস নিয়ে হেমন্তের আগমন ঘটে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় 'হেমন্ত' এবং 'শীত' দুই ঋতু যেন একই মেলবন্ধনে আবদ্ধ। একই সাথে দুই ঋতু যুগল রূপে এসে হাজির হয়। শীত এবং হেমন্তের এই মিলনক্ষণে বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে বা স্কারসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে ভ্রমণে বাহির হয়। এ সময় ধর্মীয় পুন্যার্থীরাও বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরতে যান। আবার অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাবলিগ করতে বাহির হন। কারণ অনেক বিদগ্ধজনেরা বলে থাকেন শীতকাল ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত প্রিয়। শীতকালে গরম কাপড় পরিধান করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বহুদূরের পথ যাতায়াত বা ঘোরাফেরায় তেমন কোনো কষ্ট হয় না। রৌদ্রের উত্তপ্ততা কম থাকে। বৃষ্টিবাদল থাকে না। পথঘাট শুকনা থাকে। যার কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে গ্রাম-গ্রামান্তরে অবাধে চলাফেরা করা যায় এবং সর্বত্র ভ্রমণ করা যায়।

শীতের সময় শহর এবং গ্রামবাংলার সর্বত্র ছোটো ছেটো ছেলে মেয়েদের 'চড়ুইভাতি' বা বনভোজন করতে দেখা যায়। তারা একসাথে মিলিত হয়ে শীতের সকালে বা সন্ধ্যায় নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্যদিয়ে বনভোজনের উৎসবে মেতে উঠে।

শীতের মৌসুমে শহর, শহরতলী এবং গ্রামবাংলার অনেক স্থানে শীতের সন্ধ্যায় যাত্রা, জারি গান, পালাগান, গাজীর গান, মুর্শিদি এবং মারফতি গানের আয়োজন করা হয়। সারারাত্রি ধরে মানুষ এসব গান খুব মনোযোগ সহকারে শোনে। এ সকল গান লোকায়ত বাংলার এক চিরায়ত ঐতিহ্য বহন করে।

শীত ঋতু একদিকে আরামদায়ক অন্যদিকে কষ্টের। যাদের গরম কাপড়ের অভাব নেই শীত নিবারণের বস্ত্র আছে; শীত নিরোধক ঘরবাড়ি আছে; শীতের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা আছে তাদের কাছে শীতকাল অত্যন্ত আরামদায়ক। অন্যদিকে যাদের গরম কাপড়ের একান্ত অভাব; পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নেই; বাসস্থান নেই–আশ্রয় নেই তাদের কাছে শীতঋতু অতীব কষ্টদায়ক। তারা কেউবা ফুটপাতে, কেউবা রেললাইনের প্লাটফর্মে, কেউবা অফিস-আদালতের খোলা বারান্দায় হাড় কাঁপানো কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে রাত্রিযাপন করে। এদের মধ্যে কেউবা টোকাই, কেউবা ছিন্নমূল পথশিশু, কেউবা ভিখারি, কেউবা বাস্তুহারা ভবঘুরে। আবার কেউবা অসহায়, এতিম, অনাথ। ওদের কারো কারো ভাগ্যে সমাজের বিত্তবানদের সুদৃষ্টি পড়ে। তারা হয়ত শীত নিবারণের জন্য দু'একটা গরম কাপড়ের সহযোগিতা পায়। আর যারা কারো নজরে আসে না, তারা হতভাগ্যই বলা যায়। তারা প্রচণ্ড পৌষ–মাঘের কঠোর শীতের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। আর যারা রোগাটে, বয়োবৃদ্ধ, ক্ষুধাতুর, শীর্ণকায়, অনাহারী তারা কেউ কেউ তীব্র শীতের সাথে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে। শীতের এই আরেকটি করুণ অধ্যায়।

এমনিভাবে শীত আসে। শীত এসে তার আগমনী খবর জানান দেয় বাংলার আপামর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, শিশু, নর-নারী সকলের কাছে। সবাইকে প্রস্তুত হতে বলে। তাকে যেন সবাই সহজভাবে মেনে নিয়ে তার বৈশিষ্ট্যকে মোকাবিলা করে। শীতের এই আসা এবং চলে যাওয়া; এটি বাংলার আবহমান কালের চিরন্তন রীতি। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই প্রবাহ চলে আসছে। এভাবে হয়ত চলবে অনাদিকাল পর্যন্ত।

পুত্র

অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক চলচ্চিত্র

সুফিয়া বেগম

মূলধারার চলচ্চিত্র *পুত্র*। যার চিত্রনাট্য, সংলাপ ও কাহিনি দর্শক হৃদয়কে করে আলোড়িত ও বিমোহিত। একটি অটিস্টিক শিশুকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে কাহিনি ও দৃশ্যপট। রেহমান দম্পতির দুই ছেলে, বড়ো ছেলেটি একটু অন্যরকম। সমাজের নিয়মনীতির ঘেরাটোপের বাইরে বেড়ে ওঠা। ১ নভেম্বর বসুন্ধরা মার্কেটের স্টার সিনেপ্লেক্সে *পুত্র* ছবিটির প্রিমিয়ার শো'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, 'আমরা পৃথিবীর কেউ নিখুঁত নই। আমাদের সবারই কিছু না কিছু খুঁত আছে। আমরা পরিপূর্ণ বা পারফেক্ট মানুষ নই। তেমনি আমাদের অটিস্টিক

শিশুদেরও অনেক গুণ রয়েছে যেগুলো আমাদের নজর কাড়ে না। সঠিক পরিচর্যা পেলে এই অন্যরকম শিশুরাও হতে পারে জগৎখ্যাত।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা একটু অন্যরকম মনোযোগ দাবি করে। অথচ ওদের দেখলেই আমরা জিজ্ঞেস করি– তোমার নাম কী? বাবার নাম কী? তুমি কি স্কুলে যাও ইত্যাদি। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের আমরা অনেকেই অভিশাপ বা সমাজের বোঝা মনে করি। তারা সমাজের বোঝা নয়; সঠিক যত্ন ও বিশেষ মনোযোগ পেলে তারাও সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারে।

অটিজম কী ও কেন হয়– চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমনি তাত্ত্বিক জ্ঞান চলচ্চিত্রটির কোথাও আরোপিতভাবে আসেনি। খুউব মশৃণভাবে, বড়ো মৃদুলয়ে কোনো সংলাপে এসেছে অটিজম বিষয়টি। তবে জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অটিজম শিশুদের ক্ষেত্রে 'না' বলতে। *পুত্র* ছবির যে কাহিনি ও সংলাপ তা চিরচেনা শব্দমালা হলেও হৃদয়কে নাড়া দেয়– যখন রেহমান সাহেব বলেন, 'আমার সঙ্গে এসব হবে কেন? জ্ঞানত আমি কারো ক্ষতি করি নাই। কাউকে দুঃখ দিয়ে কোনো কথা বলি নাই'। রেহমানের অশ্রুভেজা চোখ, রুদ্ধ হয়ে আসা কণ্ঠ, একটি দৃশ্যে ক্লোজআপ রেহমান দর্শকের মনকে আপ্লুত করে।

সমগ্র ছবিতে মালিহার চরিত্রে জয়া আহসান সত্যি অনন্য। তাঁর সফসটিকেটেড সংলাপ উচ্চারণ নীরব শারীরিক ভাষা অনেক কিছু বলে দেয় দর্শককে। দৃশ্য যেন কথা বলে। ক্লোজআপ কোনো চিত্রায়নের পরেই লংশটের যে দৃশ্য আমরা লক্ষ করি তা সত্যি মনে রাখার মতো। চিত্রনাট্য, কাহিনি ও সংলাপ ছবিটিকে অনেক উচ্চমাপে নিয়ে গেছে। কী নেই ছবিটিতে– বিনোদন ও সচেতনতামূলক বার্তা, একটি ব্লাইনডিং মেকিং ছবি *পুত্র*। ছবির কাহিনিকার একজন সরকারি আমলা। তিনি বিটিভির মহাপরিচালক হারুন রশীদ।

পরিচালক বিভিন্ন চরিত্রে যাদের নির্বাচন করেছেন তা যথাযথ। তবে দুএকটি দৃশ্যে মালিহার সংলাপ উচ্চারণের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তি মেলেনি। এটি আরেকটি ত্রুটি। এক্ষেত্রে পরিচালক আর একটু মনোযোগী হলেই পারতেন। সামগ্রিকভাবে নির্মাণ কৌশলে ছোটো পর্দার ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আবহ সংগীত যথাযথ। গানগুলো মন কেড়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রযোজনায় এবং ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি.-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনামূলক চলচ্চিত্র এটি।

ছবিতে দু–চারটে দৃশ্যের পরেই রেহমান দম্পতিকে দেখি ভালোবাসায় অভয়ারণ্য নামক বডিং স্কুলে। এরপরেই মালিহা দৃশ্যে স্বপ্রতিভ হয়ে উঠে। পুত্র সূর্যকে হারিয়ে মালিহা অনেক সূর্যের মা হয়ে থেকে গেছে 'ভালোবাসার অভয়ারণ্যে'। কেমন করে মালিহা (জয়া আহসান) যুক্ত হলো 'ভালোবাসার অভয়ারণ্য'র সঙ্গে তা শিমুলের (ছবিতে জয়া আহসানের স্বামী) সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটে উঠে, এ দৃশ্যের চিত্র যেন অসাধারণ। প্রিমিয়ার শো'তে হল ভর্তি দর্শকের চোখ ভিজে উঠে মালিহার জীবন সংগ্রামের করুণ কাহিনি দেখে। মালিহার শাশুড়ি একদিন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ফেলে আসে বাসস্ট্যান্ডের কাছে। শুধু বাচ্চাটি অটিস্টিক এটাই তার অপরাধ। অটিস্টিক শিশুকে নিয়ে শুরু হয় মালিহার পথ চলা। একটি দৃশ্যে তসবি জপছিলেন মালিহার শাশুড়ি। মালিহা তার পুত্র সূর্য কোথায় জানতে চান শাশুড়ির কাছে। জেরার এক পর্যায়ে শাশুড়ি জানান বাসস্ট্যান্ডের কাছে সূর্যকে ফেলে এসেছেন তিনি। শাশুড়ির কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হয় গান-বাজনা করা মায়ের পেট থেকে এরচেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

প্রচণ্ড বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। দৌড়ে যায় মালিহা। পুত্রকে ফিরে পেয়ে বাবা-মার কাছে যায়। সেখান থেকে প্রত্যাখ্যান হয়ে আসে মালিহা। অটিস্টিক শিশু নয় মালিহাকে একা আশ্রয় দিতে চায় বাবা-মা। মালিহা আশ্রয় খোঁজে এক কাজিনের বাসায়। লোলুপ কাজিনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে পুত্রসহ মালিহা। একটি চলমান যান এসে মা-পুত্রকে ধাক্কা দিলে স্পট ডেথ হয় সূর্যের।

ছবির গল্পকে ঘিরে যত বেশি বাক খাওয়ানো যায়; ছবি ততই শক্ত গাঁথুনির ওপর দাঁড়ায়। *পুত্র* ছবিটিতে প্রতিটি চরিত্রের চিত্রায়নে দর্শক মনে উৎকণ্ঠা আগ্রহ জাগাতে পরিচালকের যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। *পুত্র* ছবির শেষভাগে মালিহার স্বামী ফিরে আসে। স্বামীর চরিত্রে শিমুলের অভিনয় মনে রাখার মতো। মালিহার কান্নার দৃশ্য, সংলাপ উচ্চারণে কোনোভাবে ছবির দৃশ্য মনে হয়নি। প্রতিটি দৃশ্য যেন জীবন্ত। ছবিতে রেহমান দম্পতির অটিস্টিক শিশু নিয়ে যত না বিড়ম্বনা, তা ছাপিয়ে মালিহার কষ্ট, জীবন কাহিনি দর্শক হৃদয়ে আলোড়ন তোলে বেশি।

যখন মালিহার স্বামী 'ভালোবাসার অভয়ারণ্য' বডিং স্কুলে সব অটিস্টিক বাচ্চাদের বাবা হয়ে থাকতে চায়, তখন মালিহার স্বামীর প্রতি দর্শক অনুভূতি অনন্য এক মাত্রায় পৌঁছায়। এক ধরনের উঁচু মাত্রার আবেগ দর্শককে মোহিত করে। আবার অটিস্টিক শিশুর শ্রেষ্ঠগায়কী ক্রেস্ট প্রদানের দৃশ্য কিছু গতানুগতিকতা নিয়ে আসে ছবিতে। গান, গানের দৃশ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কিছুটা সংগতিহীন মনে হয়েছে একটি অটিস্টিক শিশুর নৌকা বাওয়া। এটি যেন ড্রামাটিক করার জন্যই করা। ছবির ছন্দ-লয় আর গতির সিংকোনাইজেশন চমৎকার। চিত্রায়ন ভালো। লোকেশন চিত্তাকর্ষক। ছবিতে যার যার চরিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানানো যায়।

সুন্দরী ভিয়েতনামে রাষ্ট্রীয় আতিথ্য

কালী রঞ্জন বর্মণ

চাকরির সুবাদে বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারমধ্যে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে ভিয়েতনাম সফর অবশ্যই এক ভিন্নমাত্রার গুরুত্ব বহন করে। কারণ এর পূর্বে অন্যান্য দেশ ভ্রমণ ছিল কোনো প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণের অংশ অথবা কেনো কনফারেন্স বা মেলায় অংশগ্রহণের মনোনয়ন। কিন্তু এই মনোনয়ন ও ভ্রমণ ছিল ভিন্ন অনুভূতি ও নতুন অভিজ্ঞতার।

অবশ্য সুযোগটা এসেছিল পর্যটনমন্ত্রীর সৌজন্যে। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি'র নেতৃত্বে ৯ (নয়) সদস্যের ডেলিগেশন টিমের অন্যতম সদস্য হিসেবে আমার এই ভ্রমণ।

সৌন্দর্য পিয়াসি ও ভ্রমণবিলাসী মানুষ মাত্রেরই বিদেশ ভ্রমণের কথায় মন পুলকিত হয়। কিন্তু ভিয়েতনাম ভ্রমণের সাথে তুলনা কার? কারণ 'ভিয়েতনাম' কথার সাথেই যে জড়িয়ে আছে আবেগময় অনেক স্মৃতি। আমাদের কৈশোর ও তারুণ্যের অনেক আবেগ, যন্ত্রণা ও চেতনার আর এক নাম 'ভিয়েতনাম'। বিশেষত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনতার সাথে আমাদের চেতনার নৈকট্য আরো নিবিড় হয়। দখলদার শত্রু দ্বারা আক্রান্ত উভয় দেশের যুদ্ধরত জনতা এসময় পরস্পরের সাথে আরো বেশি একাত্মতা অনুভব করে।

ষাটের দশকের শেষার্দ্ধে এবং সত্তর দশকের প্রথমার্ধে ছাত্রাবস্থায় ভিয়েতনামে বর্বরোচিত যুদ্ধের প্রতিবাদে রাজপথে মিছিলে, পোস্টার-প্লাকার্ডে, প্রতিবাদী কবিতা মঞ্চে অংশগ্রহণের স্মৃতি আমাকে আবেগতাড়িত করে। যুদ্ধে-বিপ্লবে বিদগ্ধ তাপস মাটিতে পদার্পণ করার আনন্দ শিহরণে আমি আপ্লুত। সেই চঞ্চল কৈশোর ও টগবটে তারুণ্যের দুরন্ত দিনগুলোতে ভিয়েতনাম বলতেই উচ্চারিত হতো ভিন্ন আবেগ–

সুন্দরী ভিয়েতনাম, তুমিতো সুন্দরীই আছ
কিন্তু আজ তুমি সহস্র সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত
কেননা, তোমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে পাশবিকতার ঝঞ্ঝা
এবং বুকে তোমার সন্তানদের লক্ষ লক্ষ নিরীহ কবর।
('ভিয়েতনাম'– ফ্রাঞ্জ হেলেন্‌স, বেলজিয়াম
অনুবাদ: পবিত্র জানা রায়)

যাই হোক দাপ্তরিক সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে অবশেষে ১৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখের রাতদুপুরে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস্– এর এয়ার বাসে সোজা সিঙ্গাপুরে গিয়ে যাত্রা বিরতি। সেই ভোররাতে চাঙ্গি বিমানবন্দরে মন্ত্রী মহোদয় এবং তাঁর সফরসঙ্গী সহধর্মিণী মিসেস লুৎফুন নেছা খান ভাবিকে আপাতত বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে আমরা কয়েকজন কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরার পর ২নং টার্মিনালে একটি খোলা রেস্টুরেন্টে বসে গেলাম। একটু প্রারম্ভিক আলাপচারিতা করতেই টার্মিনালের এত উজ্জ্বল আলো ভোরের আলোয় কেমন ফিকে হয়ে এল। এই সময় প্রায় রাতভর জাগরণের পর উদরের অবধারিত চাহিদাটি আমরা সম্মিলিতভাবে বুঝে ওঠার আগেই বুঝে গেলেন আমাদের সঙ্গী 'নভো কার্গো সার্ভিসেস লি.' এর এমডি সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। তিনি স্বভাবে চটপটে, হাস্যোজ্জ্বল ও করিতকর্মা মানুষ। ঝটপট সবার জন্যে একটি মানানসই ম্যানু ঠিক করে মূল্য পরিশোধপূর্বক স্বয়ং স্বেচ্ছাশ্রমে সবার সামনে খাদ্য পরিবেশন করলেন। কার্গো সার্ভিসের পাশাপাশি এই ধরনের হসপিটালিটি সার্ভিস প্রদানেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত তা প্রমাণিত হলো। সেই সঙ্গে 'বাংলাদেশ মনিটর'–এর সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম এবং অ্যাপেক্স গ্রুপের

হো চি-মিন-এর সমাধিসৌধে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেননসহ লেখক ও প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

এমডি হারুণ অর রশিদ সাহেবের বিদগ্ধ জীবনচরিত আলোচনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রসময় কথার ফুলঝুরিতে অবলীলায় কেটে গেল আমাদের প্রতীক্ষার নির্ধারিত সময়। তেমন কোনো কষ্ট বা ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।

এরপর ১৫ মার্চ সাতসকালের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর টু হ্যানয় যাত্রা। হ্যানয়ের 'নই বাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে' মন্ত্রী মহোদয় এবং প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানোর জন্য দাপ্তরিক টিমসহ অপেক্ষা করছিলেন ভিয়েতনামে কর্মরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. সাহাব উল্লাহ্ এবং ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট পার্টির দুই প্রতিনিধি। এরপর ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কাম গাইড হিসেবে দুই তরুণ তরুণী সড়ক পথে আমাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন হ্যানয় সিটির উদ্দেশে।

পথে যেতে যেতে লক্ষ করলাম বিমানবন্দর থেকে হ্যানয় যাওয়ার মহাসড়কটি আরো সম্প্রসারণ ও দৃষ্টি-নন্দন করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের কাজ চলছে, যা ভিয়েতনামে সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বলেই মনে হলো।

মন্ত্রী মহোদয়ের জিপ সামনে এবং তারপরেই আমাদের মাইক্রোবাস– তীব্রবেগে ছুটে চলেছে হ্যানয়ের উদ্দেশে। রাস্তার দুই পাশেই গুচ্ছ গুচ্ছ ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেত, আলপথ এবং গণকবর/সমাধি। মনে হলো কী অত্যাচার, নিপীড়ন, যুদ্ধ, ধ্বংস এবং বীভৎসতার ঝড় বয়ে গেছে দেশটির ওপর দিয়ে। কিন্তু গত ৪০ বছরে তারা ঠিকই সামাল দিয়ে নিয়েছে। আমাদের মতো ওদেরও প্রায় ৩২ লক্ষ লোকের প্রাণ গেছে দীর্ঘস্থায়ী এই যুদ্ধে। সড়ক পথে যাওয়ার সময় কোনো কুঁড়েঘর চোখে পড়ল না বরং অধিকাংশই পাকা ও আধা-পাকা বাড়ি। রাস্তার দু'পাশে অনেকগুলো গণকবর চোখে পড়ল– যা চিহ্নিত ও পাকা করে বাঁধানো। এরমধ্যে যুদ্ধকালীন গণকবর ছাড়াও রয়েছে সাধারণ কবর/সমাধি ভিয়েতনামের স্থানীয় রেওয়াজ অনুযায়ী এলাকার মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হয় দুই জমির মধ্য সীমার 'আইল'– এর ওপর এবং তা পাকা করা হয়।

ভিয়েতনামের জনগণের ওপর আমেরিকার সৈন্যদের সেসময়ের যে বর্ণনাতীত দানবীয় অত্যাচার– যা খোদ আমেরিকান জনগণকেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করেছে, ব্যথাতুর করেছে– তাদের কাঁদিয়েছে। মনে পড়ে একটি ঘটনা সে সময় মার্কিন মুলুকে তথা বিশ্বে ভীষণ তোলপাড় তুলেছিল।

উত্তর ভিয়েতনামের হাই ফঙ– এর কাছের একটি গ্রামে নাপাম বোমা ফেলেছিল আমেরিকানরা। বোমার আগুনে পুড়েছিল বিপন্ন এলাকা এবং পুড়ে মরেছিল অনেক শিশু, নারী ও পুরুষ। ধ্বংসের এই বীভৎস দৃশ্য দেখে মার্কিন মুলুকের বারো বছরের বালিকা বারবারা বীডলার একটি কবিতা লিখে ফেলে। 'Venture' নামে একটি আমেরিকান পত্রিকা কবিতাটি প্রকাশ করলে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। বারবারার এই মানবিক ও সাহসী সৃষ্টিকর্মকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে ভিয়েতনামের প্রখ্যাত কবি ও 'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম'– এর তৎকালীন উপমন্ত্রী হুয়ে কান একটি কবিতা লিখে বারবারাকে উৎসর্গ করলেন:

'বারবারা বীডলার, আমার বারো বছরের ছোট্ট বোনকে'
সাগরপাড়ের ছোট্ট মেয়ে বারবারা!
গায়ের রং তোমার ভিন্ন হলেও
হাইফঙের কাছে
ভয়ার্ত শিশুদের সেই চিৎকার
তুমি স্পষ্ট শুনেছ–
যে শিশুগুলো আমেরিকান বোমার আগুনে
পুড়ে মরেছে,
যাদের আগুনধরা কাপড়ের টুকরোগুলো
আকাশে বাতাসে উড়েছে।
(অনুবাদ–বিজন ঘোষ)

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নির্ধারিত 'মোভেন পিক হোটেল' হ্যানয়– এ গিয়ে চেক ইন, লাঞ্চ ও বিশ্রাম। সন্ধ্যাবেলায় স্বল্প সময়ের জন্য হ্যানয় শহর ঘুরে দেখা। সাদামাটা বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শহর। শহরের সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছোঁয়া থাকলেও যুদ্ধের ক্ষত গত ৪০ বছরে ঢেকে দিয়েছে পরিকল্পিত উন্নয়ন। যে হোটেলে আমরা উঠেছি তার এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, এই বনেদি হোটেলও আক্রান্ত হয়েছিল, যুদ্ধের চিহ্ন বিদ্যমান দালানের গায়ে। শেলের চিহ্নসহ অনেক যুদ্ধস্মৃতি ছিল– যা এখন আর বোঝার উপায় নেই।

শহরের রাস্তা এবং ফুটপাতে ঢাকা শহরের মতো যানে ও বাহনে এমন গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি অবস্থা কোথাও চোখে পড়ল না। তবে যা চোখে পড়ল তাহলো প্রতি রাস্তায় ট্রাফিক মোড়ে মোটর বাইকের বিশাল মিছিল। দূর থেকে মনে হয় পিপীলিকার সারি পিলপিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও থামছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় বাস, কার ও জিপের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এটাই তাদের ঐতিহ্য– যা অনেকটা পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী।

পরদিন ১৬ মার্চ সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিক সভা হয় ভিয়েতনামের সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী (লিডার) হোয়াং তোয়ান অ্যান (Hoang Tuan Anh) এর সাথে– তাঁর অফিসে। উভয় দেশের পর্যটনের উন্নয়নে সভায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যটন উন্নয়নে উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান, ভিয়েতনাম কর্তৃক বাংলাদেশকে পর্যটন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং 'বাংলাদেশ পর্যটন বর্ষ-২০১৬' উৎসবে ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদল প্রেরণসহ উভয় দেশের মধ্যে সরাসরি আকাশ পথের যোগাযোগ নিশ্চিত করার ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে উভয় দেশ একমত হন। আকাশ পথে সরাসরি উড়ে আসার ব্যাপারে উভয় প্রতিনিধি দলের অভিব্যক্তি ছিল বেশ উচ্চকিত ও আন্তরিক । এছাড়া বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপনার স্থাপত্য-শৈলী, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি আলাদা আকর্ষণ আছে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পর্যটন আকর্ষণ আছে– তা নিয়ে এই এলাকায় পর্যটন উন্নয়নে 'বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পর্যটন আকর্ষণ' নামে একটি আঞ্চলিক পর্যটন বলয় গঠন করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা সহজীকরণের ব্যাপারেও সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ভিয়েতনামের মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে জানান।

মন্ত্রী পর্যায়ের সভার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা দলের অন্যান্য ছয় সদস্য ভিয়েতনাম জাতীয় পর্যটন কর্তৃপক্ষের VNAT (Vietnam National Administration of Tourism –এর আমন্ত্রণে তাঁদের সদর দপ্তরে এক আলোচনা সভায় যোগ দিই। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ এই আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে, ভিয়েতনামের পর্যটন শিল্পে এ বছর বিদেশি পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ মিলিয়ন; যেখানে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা ৩৮ মিলিয়িন। গত বছর এ খাতে তাদের বার্ষিক আয় ছিল ১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আরো জানা গেল যে, পর্যটকদের সেবা প্রদানের জন্য তাদের প্রস্তুত রয়েছে ৩,৬৫,০০০টি কক্ষ সংবলিত ৮২টি পাঁচ তারকা, ১৮৪টি চার তারকা এবং ৩৮৫টি তিন তারকা হোটেল।

ভিয়েতনামের মূল পর্যটন আকর্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংবলিত সমুদ্রসৈকত ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। তাদেরই ভাষা অনুযায়ী এই সম্পদ নিয়েই তারা বিশ্ব পর্যটন বাজারে তোলপাড় বাণিজ্যিক অনুসন্ধান ও প্রচারণায় নেমেছেন– যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

কারণ ১৬৫ মিলিয়িন মানুষের দেশ বাংলাদেশ তাদের কাছে অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় পর্যটন বাজার। একই দিন বিকেলে ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমাদের আমন্ত্রণ। প্রথমে বহির্বিষয় সম্পর্কিত (External Relation) কেন্দ্রীয় কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও মতবিনিময়। যদিও আলোচনার তিনিই প্রধান বক্তা। ভিয়েতনামের চলমান উন্নয়নের ধারা, নীতি ও কৌশলের বিস্তারিত ব্যাখা দেন তিনি। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কমিশনের চেয়ারম্যান– এর আতিথেয়তায় আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় অংশগ্রহণ। এ রকম স্বল্প পরিসরে বিশাল আয়োজন এবং অতি আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্যায়ন যেন আমাদের বাঙালি আতিথেয়তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভিয়েতনামের জাতীয় স্থানীয় বিভিন্ন খাবার তথা আমাদের বিজাতীয় খাবারগুলো যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারিনি। বিশেষত আস্ত ঝিনুকের কোপ্তার স্বাদ জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারব না। ভোজ সভায় চর্ব চোষ্য, লেহ্য পেয় কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। বিশেষত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিতা কমনীয় পরিবেশক রমণীদের রমণীয় পরিবেশনায় কী এক মুগ্ধতায় আমরা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম খাদ্য গ্রহণকালেও।

১৭ মার্চ দিনটি আরো বেশি ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হলো। সকালে উঠেই নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কমরেড হো চি মিন– এর 'সমাধি সৌধে' শ্রদ্ধা নিবেদন। সময়মতো সমাধি সৌধ অঙ্গনে পৌঁছে দেখি সমাধির সামনে বিরাট প্যারেড স্কোয়ারে হাজার হাজার শিক্ষার্থী লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে মাইকে তাদের নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী তারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে সমাধি সৌধে প্রবেশ করছে। আমাদের আগমনের সংকেত পাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে আমাদের বিশেষ আয়োজনে সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। ফুলের স্তবক পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করাছিল। আমরা সারিবদ্ধ ভিয়েতনামি শিক্ষার্থী শিশুদের অনুসরণ করি এবং একটি কাঁচের জারে আবদ্ধ মমিকৃত হো চি মিন– এর প্রাণহীন দেহ দর্শন করে নির্দিষ্ট পথ বেয়ে বেড়িয়ে আসি। এমন পরিবেশ ও আয়োজন দেখে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা মনে পড়ে যায়।

সমাধি সৌধের পেছনে অনতিদূরে হো চি মিন–এর আবাসস্থল যা বর্তমানে একটি স্মৃতি জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার দর্শক সারিবদ্ধভাবে বাড়ির বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করছেন। গাইড এ প্রসঙ্গে আমাদের জানালেন, শেষ জীবনেও তিনি রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট ভবনে বসবাস না করে এই বাড়িতেই থাকতেন। যেখানে মাঝে মাঝেই মার্কিন বিমান বোমা ফেলত। তার বাড়িতে প্রদর্শিত ঘর, আসবাবপত্র শোবার খাট, পড়ার চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি তৈজসপত্র এবং ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র দেখলে মনে হয় ন্যূনতম সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন মানুষ কতখানি অসাধারণ হতে পারে প্রেসিডেন্ট হো চি মিন তার জলন্ত উদাহরণ। তাঁর স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে মনে পড়ল হো চি মিন শুধু একজন আত্মত্যাগী রাজনৈতিক বিপ্লবী নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ দরদি মানুষ ও মরমি কবি। ঘুরতে ঘুরতে অনেক আগে পড়া তাঁর একটি কবিতা মনে পড়ল; কবি হো চি মিন তথা সবার প্রিয় আঙ্কেল হো একদা গবাদের অন্তরালে থাকতে লিখেছিলেন–

সেই ভোরে ওঠে সূর্য, পাঁচিল বেয়ে
দরজায় মারে টোকা
দুয়ারে কুলুপ, আলোর বারণ ঢোকা।

এরপর দিনভর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রথমে পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী নওয়েন হোং ট্রুয়ং (Nguen Hong Truong) এর সাথে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি সাধারণ বাড়ির দোতলায় তাঁর অফিস। কোনো জাঁকজমক আসবারের বাহুল্য নেই। একটি সাদামাটা কনফারেন্স টেবিলের এপার ওপারের আলোচনা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হয় আন্তরিক পরিবেশে। আলোচনায় দুই দেশের পর্যটন উন্নয়নে, বিমানবন্দর নির্মাণে সহযোগিতা এবং বিমান পরিবহণ সহজতর ও সরাসরি করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের ব্যাপারেও উভয় দেশ সম্মত হয়। বিকাল সাড়ে তিনটায় ভিয়েতনাম জাতীয় সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পিএইচডি নগুয়েন ম্যানতিয়েন (Phd. Nguen Manhtien) –এর সাথে ওচট ভবনের বিশাল হল ঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের নারীদের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের ব্যাপারে উভয় দেশ কাজ করবে বলে মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও আলোচনায় উভয় দেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণসহ জাতীয় সংসদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

একই দিন সন্ধ্যা ৭টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– এর ৯৫তম জন্মবার্ষিক ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও ডিনারের আমন্ত্রণে আমরা পুরো টিম উপস্থিত হই রাষ্ট্রদূত জনাব মো. শাহাবউল্লাহ্‌র বাসভবনে। বাসার স্বল্প পরিসরে বেশ বড়োসড়ো আয়োজন। অনুষ্ঠানে হ্যানয়ে অবস্থানরত অন্তত জনা পঞ্চাশেক বাংলাদেশি উপস্থিত হয়েছেন। যথারীতি আলোচনা, অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পর ডিনারে আপ্যায়িত হওয়া গেল। রাষ্ট্রদূত পত্নি বেশ করিতকর্মা গৃহিণী বটে। নিজ হাতে রন্ধন ও পরিবেশনায় সকলের রসনা পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। বুফে পদ্ধতিতে আহারকালে অন্যান্য অভ্যাগত বাংলাদেশিদের সাথে আলোচনায় জানা গেল যে, এখানকার অধিকাংশ বাংলাদেশির অবস্থান মূলত ব্যবসাগত কারণে দেখে বেশ ভালো লাগল। মনে হলো– হায়রে ঘরকুনো বাঙালি, সময়ের প্রয়োজনে আজ তার বাণিজ্যতরী কত না ঘাটে ভিড়ছে!

আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং রাষ্ট্রীয়রীতি সিদ্ধ। বাংলাদেশের মন্ত্রী মহোদয় নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন সাবলীল ইংরেজি ভাষায়; অপর পক্ষ দোভাষীর মাধ্যমে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান মন্ত্রী ষাট– এর দশকের জনপ্রিয় তুখোড় বামপন্থি ছাত্রনেতা রাশেদ খান মেনন সেই সময়ের আন্দোলনের অবস্থান তুলে ধরে ভিয়েতনামের যুদ্ধের সাথে বাঙালিদের একত্মতা ও সহমর্মিতার উদাহরণ হিসেবে সেই সময়কার একটি জনপ্রিয় স্লোগান উল্লেখ করেন– 'তোমার নাম, আমার নাম– ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম'। দোভাষীর ব্যাখ্যায় একথা শুনে নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হন।

গত দুই দিনে নিয়োজিত গাইডদের মহুর্মুহু সতর্কতা, সময়ের শাসন ও নিষ্ঠার পরাকাষ্টা পেরিয়ে যে অভিজ্ঞান অর্জন করেছি তা আমাদের জন্যেও দেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। যেমন– এক. তাদের সময়ানুবর্তিতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং পরিমিতি বোধ; দুই. দেশপ্রেম–এর সাথে মাতৃভাষা প্রীতি, কারণ এযাবৎ যে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক আলোচনাসভা হয়েছে– তার কোনোটিতেই কোনো লিডার ইংরেজি ভাষায় কথা বলেননি। যা বলেছেন তা মাতৃভাষায়। আমাদের সাথে গাইড হিসেবে নিয়োজিত একজন দোভাষী এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৮ মার্চ ২০১৫ প্রাতরাশের পরই হোটেল থেকে চেক আউট- এর পালা। আমরা হোটেল লাউঞ্জে মন্ত্রী মহোদয়ের অবতরণ ও নির্দেশনার জন্য অপেক্ষমাণ। অভ্যর্থনা কাউন্টারে একে একে রুমের চাবি বুঝে

দেওয়া, রেজিস্টারে স্বাক্ষর এবং ব্যক্তিগত খরচের বিল পরিশোধের জন্য তৎপর সবাই। এ সময় দলের অন্যতম সদস্য তৌফিক উদ্দিন আহমেদ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্যালাক্সি ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল) তার বাড়তি বিলের কাগজ নিয়ে দেখেন সেখানে তার দেশের নাম লেখা হয়েছে বুলগেরিয়া। এটি দেখে দলের সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন এবং তা এই কারণে যে, তাঁর দৈহিক অবয়ব আমাদের সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় একটু ভিন্নতর অর্থাৎ ফর্সা, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। তাই ভিয়েতনামি কোনো হোটেল কর্মচারীর পক্ষে তাকে বুলগেরিয়ার নাগরিক ঠাওরানো একেবারে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অন্যান্যদের বিলের কাগজ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, আমাদের পুরো টিমের সকলের কাগজেই দেশের নাম লেখা হয়েছে বুলগেরিয়া। এ নিয়ে বেশ খানিকটা হাস্যরসের পর কারণ অনুসন্ধানে ধারণা করা গেল যে, রেজিস্টার লেখক নিশ্চয়ই বাংলাদেশের 'B' দেখেই বুলগেরিয়া লিখে ফেলেছেন এই হোটেলে বুলগেরিয়ান অতিথি আগমনের পূর্ব অভিজ্ঞতাবশত। এখানে উল্লেখ করা ভালো যে, আমাদের ব্যক্তিগত কাগজপত্র ফটোকপি, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং ইত্যাদির বিল অতিরিক্ত হিসেবে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু মূল ব্যয় অর্থাৎ হোটেল ভাড়া, যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে ভিয়েতনাম সরকার। রাষ্ট্রীয় অতিথি সেবায় ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা যে বিধিবদ্ধ রীতি ও পরিমিত বোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন– তা অনুসরণীয়।

যাই হোক, কর্মসূচি অনুযায়ী হ্যানয় ত্যাগ করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো কুয়াং নিন প্রদেশের হালং সিটির উদ্দেশ্যে। আমাদের গাড়ি বহর এগিয়ে চলল সঙ্গে দুই অতন্দ্রপ্রহরী কমরেড। হ্যানয় থেকে হা লং সিটির দূরত্ব প্রায় ১৭০ কিলোমিটার। মাঝে একটু যাত্রা বিরতি। পথের ধারের আধুনিক পর্যটন পান্থশালায় প্রাকৃতিক যোগ-বিয়োগ; এর সাথে মুখরোচক কিছু গলাধকরণ– যার যা রুচি অনুযায়ী এবং সঙ্গে অবশ্যই ক্ষুদ্রাতি পাত্রে (ছোট্ট মাটির ভাড়ের মতো) ভিয়েতনামি কফি সেবন। বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু। রাস্তার দুধারে যতদূর চোখ যায়, বিভিন্ন ধরনের ফসলের সবুজ মাঠ, গুচ্ছ গুচ্ছ ঘরবাড়ি, বাজার, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি চোখে পড়ে। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার গা ঘেঁষে একটানা পাহাড়। কখনো দূরে উঁচু পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। সব মিলিয়ে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ। যেতে যেতে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম। বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম হালং-বে দেখার জন্য। পর্যটন জগতে হালং-বে নামটি পূর্ব থেকেই বেশ পরিচিত ও আলোচিত। বিশেষত সপ্তমাশ্চর্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় আমরা যখন তুমুলভাবে ক্যাম্পেইন করছিলাম আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও সুন্দরবনকে বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে নির্বাচন করার জন্য। ২০১২ সালে শেষ সময়ের ক্যাম্পেইন– এর এসএমএস ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এক্ষেত্রে যতটুকু জেনেছি, সেসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সোৎসাহে এসএমএস এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সুন্দরবন উতরে যেতে পারেনি; কিন্তু হালং বে পেয়েছে সেই সাফল্য। তাই তাই হালং-বে দেখার জন্য এই উত্তেজনা ও অস্থিরতা।

অবেশেষে পথের দূরত্ব কমতে কমতে এক সময় শূন্যে এসে ঠেকে। আমরা পৌঁছে যাই হালং-বে সিটিতে। হালং-বে উপসাগরের পাশ ঘেঁষেই শহরে ঢোকার রাস্তা। সৈকতের বিপরীতে সারি সারি সুরম্য ও সৌন্দর্যময় অট্টালিকায় বিভিন্ন মানের ও দামের বিশাল বিশাল হোটেল ও রিসোর্ট শহরটিকে ছবির মতো সাজিয়ে রেখেছে। আমরা অতৃপ্ত দৃষ্টিতে হালং-বের নীল জলরাশি দূর থেকে দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই আমাদের গন্তব্যের হোটেলে।

তখন লাঞ্চ টাইম। হালং পার্ল হোটেলে চেক ইন এবং লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পরি হালং-বে অভিযানে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম সৈকতে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে নতুন রাস্তা, বাঁধানো ঘাট তৈরি হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটি নৌকাঘাটে। আমরা উঠলাম সুন্দর রঙিন একটি ইঞ্জিনচালিত দোতলা নৌকায়। সাগরের নীল জলের ওপর পড়ন্ত বিকেলের রোদে চকচকে ঢেউগুলোকে ফালা ফালা করে দিয়ে আমাদের নৌকা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে– সামনে সবুজ জলরাশির বুকে ভাসমান ছোটো ছোটো সবুজ পাহাড় আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা যেন কোনো অচেনা মায়াপুরিতে প্রবেশ করছি– এক দিগ্বিজয়ী অভিযানে।

উত্তর ভিয়েতনামের উত্তর-পূর্ব কোণে চীন মহাসাগরের উপসাগর হালং–বে। যার আয়তন ১৫৫৩ বর্গ কিলোমিটার। নানা আকারের প্রায় দুই হাজার পাথুরে পাহাড় নিয়ে দ্বীপের আয়তন ৩৩৪ বর্গ কিলোমিটার। পাহাড়ি দ্বীপের সংখ্যা ছোটো–বড়ো মিলে ৭৭৫টি। স্থানীয়ভাবে কিংবদন্তি চালু আছে যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ভিয়েতনামকে রক্ষার জন্য দেবতারা ড্রাগনদের পাঠিয়েছিলেন এই উপসাগরে। শত্রুদের নৌযানগুলোকে প্রতিহত করার জন্য ড্রাগনরা তখন মুখ থেকে যে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে সেগুলোই প্রস্তরখণ্ড হয়ে এই ছোটো ছোটো দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয়েছে এই পাথরের দ্বীপগুলো। দ্বীপগুলো সবটাই সমান বা একরকম নয়। কোনোটি দেখতে মনে হয় সবুজ আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র পাহাড়, কোনোটি হয়ত প্রাগৈতিহাসিক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ– যা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। আবার মনে হয় ভারতীয় রামায়ণ কাহিনির মতো বুঝি হিমালয় থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে আনতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পাহাড় তুলে নিয়ে মহাবীর হনুমান যখন আকাশ পথে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন লক্ষণকে বাঁচাতে, সেই উড়ন্ত পাহাড়ের কিছু কিছু অংশ খুলে খুলে পড়ে গেছে এই সাগরে– আর তা থেকেই এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হোক, আমরা কুলের নৌকা ঘাট থেকে ইতোমধ্যে অনেক দূর চলে এসেছি। আকাশের সূর্য তখন প্রায় অস্তাচলে। সূর্যের লাল আভা সবুজ পাহাড়ের গায়ে আলো আঁধারির এক রহস্যময় রূপের সৃষ্টি করেছে– যা এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব সৃষ্টি করে। আমরা নৌকার ডেকে বসে থাকা পাঁচটি বিমুগ্ধ প্রাণী নিরুত্তর, নীরবে চেয়ে আছি সেই প্রকৃতির দিকে। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। নৌকার গতিপথ আস্তে আস্তে ঘুরে গেল ঘাটের দিকে। আমরা অন্ধকার কেটে কেটে শহরের আলোর টানে ফিরে চললাম।

সন্ধ্যায় কুয়াংনিন প্রদেশ (হালং) পাটিং কমিটির সাথে বৈঠক ও ডিনার। মাননীয় মন্ত্রী ছাড়াই অন্যান্য সদস্যরা বৈঠকে যোগ দিলাম। মন্ত্রী মহোদয়ের ঠান্ডাজনিত কারণে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি হোটেলেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ রাতেই তাঁকে শহরের একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। আমরা সবাই তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম একটি হাসপাতাল– যেখানে অযাচিত অতিরিক্ত লোকের কোনো ভিড়ভাট্টা নেই। সবকিছু যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিকঠাক চলছে। রোগীর জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার মতো কোনো বাড়তি লোকের উপস্থিতি নেই। এই পরিবেশে আমরা একই সঙ্গে এত দর্শনার্থীই বরং সেখানে বেমানান; কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিশেষ অতিথি বলে কথা।

পরদিন সকালেই সুস্থ হয়ে মন্ত্রী মহোদয় হোটেলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমাদের সকলের আপত্তি সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী হোটেল ত্যাগ করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরের দিকে

রওনা দিলেন। আমরাও তাঁর অনুগামী হলাম। তার মানসিক শক্তি শারীরিক দুর্বলতাকে এভাবেই অতিক্রম করে যাবে– আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

১৯-০৯-১৫ তারিখ আমরা হো চি মিন সিটির উদ্দেশে যাত্রা করি। হো-চি মিন সিটি– যা এক সময়ের সায়গন সিটি এবং তৎকালীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল মার্কিন মদদপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামি বাহিনীর সাথে উত্তর ভিয়েতনামি কম্যুনিস্ট বাহিনীর যুদ্ধের মাধ্যমে সায়নের পতন ঘটে– যার চূড়ান্ত ফলাফল প্রায় ৩০ লক্ষ ভিয়েতনামি এবং ৫৮ হাজার মার্কিন সেনার জীবনাবসান।

বিমানবন্দর থেকে সোজা গিয়ে চেক-ইন নভোটেল সায়গন হোটেলে, পড়ন্ত বিকেল। সন্ধায় একটুখানি শহর পরিভ্রমণ। সায়গনে ব্যবসারত কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় হলো। তাঁরা কেউ বড়ো বিজনেসম্যান নন; সবাই ব্যবসায় নতুন, স্বল্প পুঁজির কিন্তু আত্মবিশ্বাসী তরুণ উদ্যোক্তা। তাঁরা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতে তাদের অনেক সুবিধা-অসুবিধার কথা জানালেন। পরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সহায়তা করলেন।

হো চি মিন শহরটি বেশ সাজানো গোছানো মনে হয়। হ্যানয়ের তুলনায় নতুন ইমারতের আধিক্য দেখা যায় এবং হ্যানয়ের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল– স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমগ্র ভিয়েতনামেই প্রায় এক ও প্রায় অভিন্ন। অন্তত এই স্বল্প সময় অবস্থানে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে।

পরদিন ২০-০৩-১৫ তারিখ সকাল ৯.০০টায় আমাদের নেওয়া হয়– ভয়াবহ ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নবাহী জাদুঘর– 'ওয়্যার রেমন্যান্টস্ মিউজিয়াম'–এ। এটি ভিয়েতনামের একটি নামকরা বিশাল জাদুঘর– যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর; অর্থাৎ যুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই। এখন এর বার্ষিক ভিজিটরের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছোটো-বড়ো অস্ত্র অর্থাৎ পিস্তল, বন্দুক থেকে ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার পর্যন্ত এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া দেশি ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত যুদ্ধের ফটোগ্রাফসহ মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক ভিয়েতনামিদের উপর পরিচালিত পৈশাচিক নির্যাতনের অনেক বিভৎস চিত্র।

আরো আছে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত রাসায়নিক অস্ত্র ও বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় অভিশপ্ত বিকলাঙ্গ জন্ম ও জীবনের স্থিরচিত্র প্রদর্শনী–যা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখা একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

এই জাদুঘর মূলত ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, দলিল দস্তাবেজসহ যে-কোনো প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য একটি বিশেষায়িত জাদুঘর। জাদুঘর ঘুরে ঘুরে দেখার সময় যুদ্ধে ব্যবহৃত এসব প্রদর্শিত অস্ত্র, গণহত্যার ছবি, যুদ্ধের স্থিরচিত্র ইত্যাদি দেখতে দেখতে আমার সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে হলো। আমার স্মৃতিপটে আঁকা ছবি আর আজকের প্রদর্শিত ছবির মধ্যে তফাৎ খুব অল্পই মনে হলো। ভিয়েতনামে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এরকম একাধিক যুদ্ধ স্মারক জাদুঘর থাকলেও বাংলাদেশে আমরা এখনো সেই দায়িত্ববোধের জায়গায় দাঁড়াতে পারিনি। আর কত দিন?

ঐদিন সন্ধ্যায় হো চি মিন সিটি পার্টি কমিটির আমন্ত্রণে আলোচনা ও ডিনার ম্যাজেস্টিক হোটেলে। হোটেলের চমৎকার সাজানো হল রুমে উভয় পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আলোচনার পর ডিনারে নির্ধারিত বিষয়ে একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা জমে ওঠে। অনুষ্ঠানের আপ্যায়নের হোস্ট হো চি মিন সিটি পার্টি কমিটি লিডার। ম্যাডামকে দেখেই মনে হয় কোনো সহজ–সরল বাঙালি রমণী– স্নেহপরায়ণ, স্বভাবে অত্যন্ত নম্র, মাতৃত্বে স্নাত। একে একে আমাদের সবার সামনে নির্দিষ্ট ম্যানু অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ করলাম যে, আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট তারুণ্যে ঝলমল যুবকটির সামনে কোনো খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে না। তাঁর সাথে আলাপ পরিচয়ে জানলাম তিনি সিটি ট্যুরিজম অথরিটির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কিছুক্ষণ পর তার সামনে সবজি জাতীয় এক বাটি খাবার পরিবেশন করা হলো। কৌতূহলবশত কারণ জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ এবং পার্টিতে পরিবেশিত সব খাবার তার জন্য নিষিদ্ধ। বিদেশে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাছাড়া কোনো কম্যুনিস্ট দেশেও যে, ধর্মের স্বাধীনতা আছে– এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম।

ডিনার টেবিলে খাওয়া–দাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন আলোচনা চলছিল। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে সিটি পার্টি লিডার ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো স্মৃতি আছে কিনা। তিনি জানালেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের তিনিও একজন যোদ্ধা। যুদ্ধকালে তার বয়স ছিল ১০/১২ বছরের মতো। সে সময় তিনি কম্যুনিস্ট গেরিলাদের পক্ষে গোপন খবর সংগ্রহ ও সরবরাহ করতেন। এভাবেই তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে যান এবং দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পান। এই কয়েকদিনের ভিয়েতনাম ভ্রমণে মনে মনে এমনটিই চাইছিলাম যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে যেন স্বচক্ষে দেখতে পাই। আজ এই প্রথম সেই মহান যুদ্ধের একজন যোদ্ধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালাম।

খাওয়ার টেবিলে এমন গল্প ও আলোচনা চলাকালে লক্ষ করলাম, আমার উলটোদিকে বসা আমাদের রাষ্ট্রদূত পত্নী ভাবি তাঁর পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে আই লাভ ইউ- এর ভিয়েতনাম ভার্সন কী হবে তা শেখার জন্য খুব কসরত করছেন এবং মুখস্ত করার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি আমার কাছে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করল। এই বিদ্যা তিনি কোন কাজে লাগাবেন তা দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।

পার্টি শেষে এবার বিদায়ের পালা। সবাই পার্টি লিডারের সাথে করমর্দন করে প্রস্থান করছেন। আমাদের টিমের মধ্যে আমি সবার শেষে। আমার সামনে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর পত্নী। এবার বিদায় ক্ষণে ভাবী এতক্ষণ অর্জিত বিদ্যা অর্থাৎ ভিয়েতনামি ভার্সনে 'আই লাভ ইউ' বলে লিডারকে সম্ভাষণ জানালেন। লিডার ম্যাডাম অত্যন্ত পুলকিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। মাতৃভাষায় অন্যের মুখে এমন সম্ভাষণ শুনতে কে না পছন্দ করেন। আমরাও সবাই করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলাম। এই না হলে যোগ্য রাষ্ট্রদূতের যোগ্য পত্নী!

হোটেল ভবন থেকে নেমে যখন সামনে দাঁড়ালাম, দেখি রাতের আকাশ লাল আভায় আচ্ছাদিত। সামনে হরেক রঙের আলোকমালায় সজ্জিত রাজপথ, ভবন, নদীতে ভাসমান জাহাজ, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট ইত্যাদি। যেদিকে, যতদূর চোখ যায়– শুধু আলো আর আলো। এত উজ্জ্বলতা আগে বুঝি কখনো দেখিনি। হোটেলের সামনে শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া সায়গন নদীতে যেন আলোর বন্যা। একটি নদীকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য, জলকেলি, আহার, বিহার, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সবরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দৃষ্টিনন্দন একটি পর্যটন স্পট সৃষ্টি করা হয়েছে– যা অভূতপূর্ব। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য আর আলোর খেলা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যেতে যেতে যেন বলে গেল 'হায় বুড়িগঙ্গা, তোমারও তো বয়স ছিল, দেহ ছিল, রস ছিল; কিন্তু তোমার যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সেই চোখ আর উদ্যম কই!'

লেখক : অতিরিক্ত সচিব (অব.)

নোভা

রুহুল গনি জ্যোতি

'এই যে নোভা, এই এ–ই যে– এদিকে দেখো, দেখো, দেখো, দেখো, তাকাও । নোভা, ছোট্ট সোনামণিলে আমাল, এই যে আমি, দেখি মা তাকাও তো'- এভাবে আরো কত কী বলে সুপ্রভা তার ছোট্ট শিশুকন্যা নোভার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু নোভার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এক মনে নিজের দু'হাত নিয়ে কি যেন খেলছে সে। আবার যেন খেলছেও না। সারাক্ষণ কেমন যেন উদাস উদাস একটা ভাব। যেন পৃথিবীর কারো দিকেই তাকাবার সময় নেই ওর। কোনো কিছুর প্রতি ওর তেমন আগ্রহও নেই। সারাটাক্ষণ সে থাকে আপন মনে, নিজের মতো করে নিজের জগতের মাঝেই ডুবে থাকে সে।

সুপ্রভা বিষয়টি বেশ ক'দিন ধরেই খেয়াল করছে, তার কাছে ছোট্ট সোনামণিটিকে কেমন যেন অন্যরকম লাগে। ঠিক যেন ধরা যায় না। কেমন যেন একটু অসঙ্গতি। কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকতা। কি যেন নেই, ঠিক ধরা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, আবার যেন যাচ্ছেও না-এমন কিছু দেখছে সে এই দেড় বছরের ছোট্ট নোভার মধ্যে যা আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ওর অন্ততঃ সে রকমই মনে হয়। কিন্তু হাজার হোক মায়ের মন তো-বার বার ভাবেন ভুলটা আসলে কার? মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা আবার দৃষ্টিভ্রম নয় তো? অথচ অসঙ্গতিগুলো আবার ঠিক ঠিকই চোখে পড়ছে।

নোভার বাবা অপূর্বর সঙ্গেও এ নিয়ে প্রায়ই কথা হচ্ছে তার। কিন্তু তারা কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এখন কি করবে। নোভার আসলে কোনো সমস্যা আছে- নাকি এমনিতেই এমন করছে, পরে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

নোভার মা-বাবা দু'জনেই কর্মজীবী। দু'জনেরই সারাদিন অফিসের নানা ব্যস্ততায় কেটে যায়। বলতে গেলে বাসার কাজের মেয়ে জরিনার ওপরই বাচ্চাটার লালনপালনের ভার। মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ থেকে সুপ্রভার মা এসে মেয়ের বাসায় দু'চার দিন কাটিয়ে যান। সুপ্রভাও খুব চেষ্টা করে মেয়েকে কিভাবে একটু বেশি সময় দেওয়া যায়। কিন্তু সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় সেটা তার প্রায় হয়েই ওঠে না।

নোভার মা নিজের সংসার নিয়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও চেষ্টা করেন

নাতনির যত্নের দিকে একটু বিশেষ ভাবে নজর দিতে। ফলে, প্রায়ই একটু সময়-সুযোগ করতে পারলেই ছুটে আসেন ঢাকায়। মেয়ের বাসায় এসে তিনি নোভাকে নিয়েই থাকেন। ওর প্রতি সবসময়ই যেন একটু বেশি বেশি নজর রাখার চেষ্টা তার, বিশেষ করে নাতনির মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা। তার নজরে আসার পর থেকে সেই টান যেন আরো বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।

যতই দিন যাচ্ছে তার মনে নোভাকে নিয়ে উদ্বেগ যেন আরো বেশি জমাট বেঁধে উঠছে। অথচ এসব নিয়ে নিজের মেয়েকে কিছু বলতেও তার মনে কেমন যেন এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে। তিনি আসলে এ নিয়ে একটু দ্বিধার মধ্যেই আছেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না আসলে সমস্যাটা কার- এই ছোট্ট শিশুটির নাকি তার নিজের।

বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে তার নিজেরই তো কত সমস্যা, কি দেখতে কি দেখছেন তার ঠিক নেই। তবে তার কাছে কিছুতেই নোভার বিষয়টি ভালো মনে হচ্ছে না। ওর আচরণ যেন আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর মতো না। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে।

একদিন মেয়ে–জামাইকে এক সঙ্গে পেয়ে নোভার অস্বাভাবিক আচরণের বিষয়টি বলেই ফেললেন তিনি। বললেন, বাবা তোমরা ওকে একজন ভালো শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাও। হয়তো তেমন কিছু নয়, তবু আমার মনে হয়, একজন ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে নেওয়াই উচিত। আল্লাহ না করুন- যদি তেমন কিছু হয় তবে আগে থেকে অন্ততঃ চিকিৎসাটা শুরু করা যাবে।

তার মেয়ে এবং জামাই উভয়েই তার সঙ্গে একমত হয় এবং অবশেষে একদিন সময় করে ওরা নোভাকে নিয়ে ছুটে যায় দেশের বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. আলতাফ আরাফের কাছে। ডাক্তার নোভাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর বাবা-মা দু'জনকেই ডেকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, নোভা অটিজমে আক্রান্ত। অনেক আশ্বাস ও ভরসা দিয়ে বললেন, এ নিয়ে ভয় পেলে তো চলবে না। মন শক্ত করে ধৈর্যের সঙ্গে নোভাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে অনেক আশার কথাও বললেন।

ডাক্তারের প্রথম কথাতেই অপূর্বের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এর পরের কথাগুলো যেন ওর তেমন মাথায় আর ঢোকেইনি। সেদিন সুপ্রভাও বেশ ভেঙে পড়েছিল। পরে নিজেকে সামলে নেয়।

অটিজম শব্দটি তখনো এত ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল না। ফলে এ রোগের ব্যপ্তি সম্পর্কে বলতে গেলে ওদের তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। ওদের ভাসা ভাসা যে ধারনাটুকু ছিল তাতেই ওরা দুঃশ্চিন্তা আর শংকায় একেবারেই জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার বললেন- অটিস্টিক শিশুরা অস্বাভাবিক আত্মমগ্ন থাকে। এটি মস্তিষ্কের স্নায়ুগত একটি অব্যবস্থা, যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির যোগাযোগ দক্ষতা, সমাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সামর্থ্য এবং পরিবেশের প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য বাধাগ্রস্থ হয়। অটিজম একটি জন্মগত সমস্যা যা পরবর্তীতে মানসিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে, মাতৃগর্ভে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ বাধাগ্রস্থ হলে শিশুদের অটিজম দেখা দেয় বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। সাধারণত অটিস্টিক শিশুদের বুদ্ধিমত্তা খুবই কম থাকে। কিছু কিছু অটিস্টিক শিশু গণিত, সংগীত বা ছবি আঁকায় অত্যন্ত পারদর্শী হতে পারে। তবে সেটা নিতান্তই ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সারা দুনিয়ায় প্রতি হাজারে ২/১ জন অটিস্টিক শিশু জন্মগ্রহণ করে। ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে অটিজম হবার আশংকা মেয়ে শিশুদের চেয়ে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি। সাধারণত শিশুর ১৮ মাস থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যেই বাবা-মা বুঝতে পারেন যে তাদের শিশুটি স্বাভাবিক নয়। অটিজম আক্রান্ত শিশুর খিঁচুনিও হতে পারে। তাদের এই ছোট্ট শিশুটির মানসিক রোগ হওয়ার আশংকা অন্য শিশুদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অন্তত সেরকমই মনে করেন। এ জন্য তাদের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন নিজেদের মনোবল অটুট রাখা। অটিস্টিক শিশুরা দেখা, শোনা এবং শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়াতে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায়।

অটিজমের কারণ সম্পর্কে এখনো সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনো কিছু চিহ্নিত করা যায়নি। ধারণা করা হয়, জেনেটিক কারণে অটিজম হয়ে থাকে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাস, পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা, পারদের বিষক্রিয়া, ভিটামিনের অভাব, গর্ভাবস্থায় মায়ের হাম হওয়া প্রভৃতি কারণে অটিজম হতে পারে বলেও ধারণা প্রচলিত রয়েছে। তবে, এর কোনোটাই প্রমাণিত নয়। অটিজমের কারণ চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা এখনো চলছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যদি পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে একজন অটিজম শিশুরও রয়েছে সাধারণ শিশুর মতো অফুরন্ত সম্ভাবনা। প্রধান যে তিনটি সমস্যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে দেখা যায় তা হলো-স্বাভাবিক সামজিক আচরণগত সমস্যা, মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগ সমস্যা, পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপগত সমস্যা।

যেহেতু, অটিজমের একক কোনো বিশেষ কারণ নেই, তাই এর আরোগ্য লাভ কোনো সহজ কাজ নয়। ফলে, এ রোগ থেকে

মুক্তির জন্য একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি দরকার- যার মধ্যে থাকবে ওষুধ, থেরাপি, বিশেষ শিক্ষা, খাবার ব্যবস্থাপনা, ভিটামিন, এনজাইম এবং হরমোনজনিত বিষয়ে পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু।

ডাক্তারের কাছে এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত শোনার পর থেকেই শুরু হয় মেয়েকে নিয়ে তাদের জীবন সংগ্রাম। এরপর থেকে আরো ডাক্তার দেখিয়েছে তারা। কিন্তু নোভার ব্যাপারে তারা সবাই প্রায় একই কথায় বলেন। ডাক্তারের পরামর্শেই পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে দেন সুপ্রভা। কারণ, ডাক্তাররা বার বারই বাচ্চাকে বাবা-মায়ের যথাযথ মনোযোগ ও মানসম্মতভাবে সময় দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। অনেকেই আবার বেশ আশাও দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে ঠিকভাবে সময় নিয়ে চেষ্টা করলে নোভা অনেকটাই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

অনেক চিন্তাভাবনা করে অপূর্বও তার কর্মস্থল পরিবর্তন করে পোস্টিং নিয়ে এমন জায়গায় চলে এল যেখানে কাজ করে মেয়েকে সময় দিতে পারবে ঠিকই তবে সেইভাবে আর ক্যারিয়ার হবে না।

শুরু হলো মেয়েকে নিয়ে তাদের প্রাণান্তকর কষ্টের সাধনা। সবকিছুই সেদিন তাদের বিরুদ্ধে ছিল। না ছিল ভালো কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা, না ছিল তেমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে তখন মাত্র এসব নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। এখনো যে অবস্থা খুব একটা বদলেছে তাদের কাছে তা মনে হয় না। অটিজম শিশুদের চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে- এটি এখনো অনেক ব্যয়বহুল। যেখানে কিছুটা ভালো সেবা পাওয়া যায় সেখানে খরচ এত বেশি যে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষজনের পক্ষে এ ধরনের সেবা নেওয়া সম্ভব নয়। আবার যেখানে খরচ কম সেখানে প্রচণ্ড ভিড় এবং সেবার কোনো মান নেই বললেই চলে। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওরা সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছেন। সেদিন তাদের সেই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল আজ আর সে বিষয়ে তাদের মনে অন্তত কোনো সন্দেহ নেই।

সুপ্রভা এরমধ্যেই জেনেছেন যে, অটিজম আক্রান্ত শিশুকে অর্থপূর্ণভাবে কথা বলা, অন্যের সঙ্গে কমিউনিকেট করা, অন্যের ডাকে সাড়া দেওয়া, অন্যের সঙ্গে আইকন্ট্যাক্ট করা, গ্রস মোটর অ্যাক্টিভিটি (হাঁটা, দৌড়ানো, হামাগুড়ি দেওয়া, লাফানো, এক পায়ে লাফানো ইত্যাদি), ফাইন মোটর অ্যাক্টিভিটি (আঙুল দিয়ে কোনো বস্তু যেমন- কলম, পেন্সিল ইত্যাদি) ঠিকভাবে ধরা, বোতাম লাগানো, কাগজ বা কাপড় ভাঁজ করা, হাত রগড়ে ধোয়া, হাত থেকে পানি ঝাড়া) ইত্যাদি সাধারণ কাজ শেখানো অকল্পনীয় ধৈর্য্য, সময় ও প্রাণান্তকর শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। স্বাভাবিক শিশুরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকেই এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব শেখে যে, এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখী না হলে তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারতেন না যে এগুলো কোনো বিশেষ কাজ কিনা আর এসব এমন করে শেখাতেই বা হবে কেন?

নোভাকে কথা শেখানোর জন্য অনর্গল গল্প বলে যেতে হতো, অন্য কারো সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সংলাপ আদান-প্রদানের পুনরাবৃত্তি অভিনয় করে দেখাতে হতো বার বার, শত বার, কখনো তা হাজার, লক্ষ বারও করতে হয়েছে।

ধীরে ধীরে ওদের জানা হয়েছে যে, নোভা মাঝারি ধরনের অটিজমের শিকার। চেষ্টা করলে যাকে নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। ফলে ওরা আরো বেশি করে আশায় বুক বেঁধেছেন।

নোভার আগ্রহ অনুযায়ী খেলনা নির্বাচন করা হতো, চারপাশের জীব-জড়ো নির্বিশেষে সবার মুখে সংলাপ বসিয়ে গল্প বলে যেতো ওরা। মাঝে মাঝে নোভার উদাসীনতা দেখে সুপ্রভার নিজেকে খুব হতাশ মনে হতো। এসব কাজ এত বিরক্তিকর-একঘেয়ে লাগে আর এক্ষেত্রে সাফল্য ও অগ্রগতি এত ধীরে ধীরে হয় যে, কাউকে তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রতিদিন অন্তত আধাঘন্টা ধরে তাকে পেন্সিল ধরে লেখা শেখানোর চেষ্টা করতে হয়েছে। পেন্সিলটা শুধু ধরা শিখতেই তার বছর খানেক লেগে গেছে। এমনি ধরনের অসংখ্য ছোটোখাটো দৈনন্দিন কাজ পরম ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে শেখাতে হয়েছে তাকে। এসব শেখানোর সময় সবচেয়ে কঠিন কাজটা হলো তার মনোযোগ আর দৃষ্টি ধরে রাখার জন্য অনর্গল তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমনভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কথা বলে যাওয়া। সে এক নিরন্তর কষ্টের অধ্যাবসায়। যার সাফল্য খুব সহজে চোখে পড়ে না।

মাঝে এত হতাশ লাগে- মনে হয় আর কিছুই বুঝি সম্ভব হবে না। সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তারপরও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিনের পর দিন এই সব একঘেয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

আজ নোভাকে নিয়ে ওদের বড়ো কোনো স্বপ্ন নেই, শুধু মেয়েটা যেন কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের আর দশটি শিশুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে জীবনটাকে চালিয়ে নিতে পারে এইটুকুই চাওয়া। ওদের বিশ্বাস এইটুকু সাফল্য অন্তত তাদের নোভামণি পাবেই পাবে।

যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না

মাশুক চৌধুরী

যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না কেউ না
পৃথিবীতে যতবার যুদ্ধ বেঁধেছে
ততবারই পরাজিত হয়েছে পৃথিবী
যতবার যুদ্ধ হবে ততবার ছায়াপথে
সরে যাবে নক্ষত্রের আলো
আকাশ বিচ্ছিন্ন হবে নতমুখি নীলিমার মতো।

পৃথিবীতে যতবার যুদ্ধ বেঁধেছে
ততবার পরাজিত হয়েছে মানবতা
ততবার পরাজিত হয়েছে ইতিহাস

একাধিক বিশ্ব যুদ্ধেও কেউ জয়ী হয়নি
প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে মানুষ।
যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার নিহত হয় সভ্যতা।

জব্দ

শাহ্‌রিয়ার নূরী

কাছে গেলে ডাল ভাত
না পেলে নামল রাত।

মনে হয় যেন হাসি
বাঁশিতো তবু বাজে না
আড়চোখে দেখি নির্বিকার
কেউ কি জানে তোমার হাসির আকার?

একটিই শয্যা– অলীক নিভাঁজ নদী
দুরন্ত সেদিন আমি পঙ্খিরাজ বাঁকে
আজ যাব যে গাঢ় ভিসা লাগে তোমার
পাসপোর্ট জব্দ রয়েছে তোমার হাতে

এই ছায়া এই শরীর

নাজমুল হাসান

দেহের চেয়ে বড়ো এই ছায়া শরীর
নদীর স্নেহ ছাড়িয়ে প্লাবনভূমি
বনস্পতির বন্ধন ছিঁড়ে বনভূমি
বালুকাবেলা হারিয়ে তবেই উষ্ণ মরু
ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে তপ্ত লাভা
কী নাম দেবে তার?

পাতলা কুয়াশা ভেদ করে চাঁদের মায়াবি আলো
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি নাম
প্রতীক হয়ে দু'হাত বাড়ায়
দু'হাতে জড়িয়ে যার সান্নিধ্যে এলাম
তার ভূমিষ্ট হবার আগে বা পরে
আমরা পরস্পরের কতটা কাছাকাছি ছিলাম?

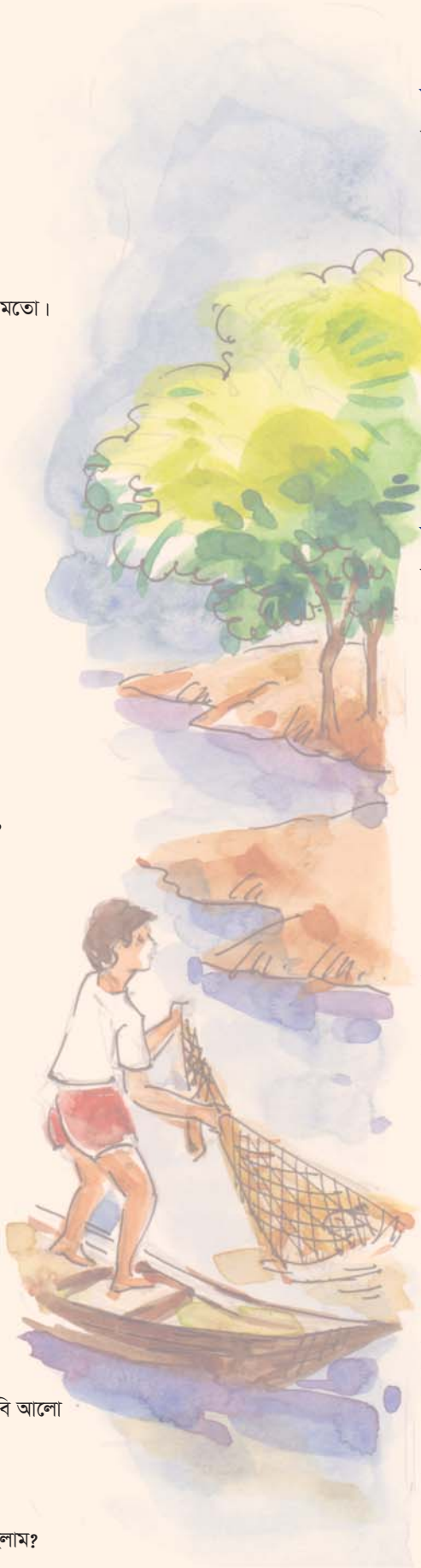

নীরবতা

জাহাঙ্গীর খান বাবু

রাতের নীরবতা আমাকে
আপন করে নিয়েছে।
গভীর রাতে হাজারো
তারার দিকে তাকিয়ে নীরবে যদি
কখনো ভাবো একবার,
হয়ত বুঝতে পারবে
আমার চলে আসাটা কতটা
ব্যথিত করেছে!

হালদা নদীর পাড়ে

সমীরণ বড়ুয়া

কর্ণফুলীর বাঁক পেরিয়ে মদুনাঘাট গেলে
দেখবি তোরা নাও ভাসিয়ে মাছ ধরে ঐ জেলে।
জোয়ার আসে কলকলিয়ে তুলে ছোটো ঢেউ
রুই, কাতালি, ডিম ছেড়েছে মারবি নাতো কেউ।
স্রোতের টানে যায় ভেসে ওই কুচরিপানার দল
বাদলা দিনে মা-মাছেরা করছে কোলাহল।
আষাঢ় মাসে বর্ষারই ঢল নামে দু'পাড় বেয়ে
খেয়া পাড়ে ইশকুলে যায় গাঁয়ের ছেলেমেয়ে।
রূপসী ওই মনোলোভা আছেই সবুজ গ্রাম
মগদাই খালে জলের ধারা ছুটছে অবিরাম।
ডাকে ডাহুক, পানকৌড়িদের দেখবি 'বাড়ি ঘোনা'
দেশের সোনা গর্ব আমার হালদা মাছের পোনা।
নদীর বাঁকে ঘুরে বেড়ায় সাদা বকের সারি
মাছের লোভে মাছরাঙা ওই উড়ছেরে ডিম পাড়ি।
সত্তারই ঘাট, পার হয়ে আজ গেলেই রাউজানে
উন্নয়নের বইছে জোয়ার দেখবিরে সবখানে।
জলের স্রোতে ঢেউয়ের তালে নাচেই বালিহাঁস
চিতল, বোয়াল, দাঁত খিলিয়ে হাসেরে ফিস-ফাস।
রুপালি চাঁদ, সাঁতার কাঁটে, জোনাক জ্বলা রাতে
জলের পরী খেলেরে ভাই কোরাল মাছের সাথে।
হালদা পাড়ে আছেরে ভাই, জেলে-চাষির ঘর
ঝড়-তুফানে মেঘের ডাকে কাঁপেরে থরথর।
কেউবা ফলায় শস্যে দানা, কেউবা কলাগাছ–
ভাটার টানে গামছা বেঁধে ধরে চিংড়ি মাছ।
কাশের বনে দেখবি তোরা ঘাস ফড়িংয়ের মেলা
ডুব দিয়ে ওই হুতুমপেঁচা করছে জলে খেলা।
নদীর মেয়ে বোয়ালিয়া, সর্তা, তেলপারই
'ইন্দ্রাঘাটে' জোয়ারেতে গোসল করে রুই।
সাম্পান বোটে চড়েই আমি, এই যে নদীর বুকে
ঝিকিমিকি রোদের হাসি দেখি পরম সুখে।
হালদা পাড়ে নাঙল মোড়ায় বসে গাঁয়ের হাট
দুপাড়জুড়ে উঠল গড়ে পাকা দোকান পাট।
চলছে নদী আঁকা-বাঁকা 'সমিতির হাট' পেরে
নায়ের মাঝি জাল ফেলেছে বৈঠা নেড়ে নেড়ে।
নাজিরহাটের পাশ দিয়ে ওই বইছে এই নদী
ধুরং খালের সাথেই মিশে চলছে নিরবধি।

কেমন ভাবনা

সাদিয়া সুলতানা

ছড়া যদি মেঘ তবে
পদ্যে ভাসে আকাশ
কবিতা হবে মহাশূন্য
ছন্দে হাসে বাতাস।

গল্প যদি গাছগাছালি
উপন্যাস মাটি
শব্দে বসে পাখপাখালি
বাক্যে জবান খাঁটি।

ভাষায় থাকে সবার বচন
মানুষগুলো সব
দীপ্তি মেঘে যাও এগিয়ে
জোরসে তোল রব।

রাত্রী মেয়ে

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

ভোরের আলোর মতো
রাত্রী মেয়ের দুটি চোখ চেয়ে থাকে
পশ্চিম আকাশের দিকে
পাখিরা আড়মোড়া ভেঙে ওঠে
বৃক্ষরা লুফে নেয় শিশিরের জল
সে জল রাত্রী মেয়ের চোখের কাজল।

মায়াবি জোছনার মিটিমিটি রুপালি আলোয়
ধোঁয়াশা কুয়াশাগুলো জমা হয় রোজ রোজ
কান পেতে তাই শুনি জোনাকির গান; সাদা কালোয়
বর্ণচ্ছটার আড়ালে রঙিন প্রজাপতি পায় নতুনের খোঁজ।
শূন্য মরুর বুকে ফিরে আসে করুণার মেঘ
উত্তাপ্ত বালুকারাশি খেলা করে জলের ভেতর
হৃদয়ে জমা শত কালিমার দাগ; বিরহ আবেগ
বাহুর বাঁধনে বাঁধে হৃদয়ের ডোর।

উদাসী রাত্রী মেয়ে কান পেতে শোনে
দুটো গাঙ শালিকের দুঃখের গান
দুধের বাচ্চা নিয়ে নিশুতি রাত গোনে
লক্ষ্মীর বিমুখতায় মুমূর্ষু প্রাণ।
রাত্রী মেয়ের চোখ থেকে ঝরে পড়ে করুণার জল
তবু নিয়তির মেঘগুলো নামায় না ঢল
চৈত্র খরায় পুড়িয়ে মারে মৃত্তিকা হৃদয়
ফেটে চৌচির সোঁদা মাঠ, ফাগুনের আগুন জ্বালা কিসের বা ভয়!

রাত্রী মেয়েটা আজ স্বপ্নের দ্বারে
হঠাৎ! বলে ওঠে 'কৃপা কর তারে'।
নিয়তির শিরে সংক্রান্তি হবে কাল
বাঁধার পাহাড় হলো সময়ের ঢাল।
ঘটনার ঘনঘটা অশান্ত অপার
রাত্রী মেয়েটার ঘাড়ে চিন্তার ভার...

জেল হত্যা

খাইরুল ইসলাম তাজ

মস্তিষ্ক শূন্য করতে চাইলেই কি করা যায়?
ক্ষণিক শূন্যতা হয়ত বিরাজ করে,
তবে সে শূন্যস্থান অতিসত্ত্বর পূর্ণ হয়ে যায়।

শীতার্ত নভেম্বরের সদ্যাগত রজনী–
চৌদ্দ শিকে পাহারাদারের উৎকীর্ণ দৃষ্টি
দেশের চার রত্ন মাথার বিশ্রাম সেথায়,
চারজন নেতা, গোধূলি বিদায়, যাচ্ছে বেলা;
হাজতজুড়ে শত্রুদলের মিত্র মিত্র খেলা।

চকিত প্রবেশ, হায়েনা স্বরূপ হামলে পড়া,
হায়েনার বিষ দাঁতে, নভেম্বরের সে রাতে
মৃত্যুস্মারক নিয়ে তারা দীপ্ত ইতিহাস,
চলছে আজো ক্ষত মুছে দেবার প্রয়াস।

মানছি, আকাশে আজ তারার হাট বসে না;
দু'একটি শুকতারা, লাজুক মিটমিট সন্ধ্যাতারা
আছে।। আরো আসছে, জেলের কলঙ্ক শুকাতে।

পরিষ্কার জেনে রাখো সে নরপিশাচের দল–
বিচারের কাঠগড়ায় সহসা দাঁড়াতে হবে।
সত্য চির বিরাজমান, চির শাশ্বত সুন্দর
অন্যায় করে পার পাওয়া যায় না;
কেননা, মহাকালের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে না।

আশা

রোকসানা গুলশান

এইভাবে বদলে যাওয়া দেখতে দেখতে
কেটে গেছে কতকাল
তবু পুরনো হলো না আকাশ।
পুরনো হলো পাহাড়
পুরনো হলো নদী
তবু পুরনো হলো না মেঘের দিন-রাত।
সেই লজ্জাবতী বেগুনি ভোরে জেগেছিলেম
শিশির-স্নাত শৈশবে
পায়েরা তৈরি হলো, পাহাড়ি পথ পাড়ি দেবার।
এইভাবে কত পথ হেঁটে হেঁটে
পৌঁছে গেলাম অচেনা ঘাটে
সামনে চলা পদক্ষেপ
বোঝা বেড়ে যায়, বাড়ে বৈঠার টান.....পিছুটান
তবু তো যেতে হয়
অবিরাম এই যাত্রায়।
চলতে চলতে পথ, পুরনো হলো বৃক্ষ
পুরনো হলো কথা
শুধু পুরনো হলো না পাখির কলতান
চলতে চলতে পথ, পুরনো হলো ঘাট
পুরনো হলো চোখ
তবু তো পুরনো হলো না আশা
আশারা বুঝি আকাশেরই
বিন্দু বিন্দু তারা
সিন্ধু সমান গভীরতার।

পৌঁছানোর আগে

মিলি হক

কত শত পথ হেঁটেছি
কত বার হোঁচট খেয়েছি
কত বার পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়েছি
বলতে পারো?
জীবন কাঁথায় নকশি তুলতে
কতবার সূচাগ্রে বিদ্ধ হয়েছি
রক্তাক্ত হয়েছি বলতে পারো?
একটা কাব্য লিখতে
কত দিস্তা ফুলস্কাপ পেপারকে
দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে দিয়েছি
কালি উগরাতে নিঃশেষ হয়েছে
কত ডজন কলম বলতে পারো?
ক্লান্ত হইনি, শ্বেত কমলের শয্যাকেও
মনে হয়নি পরম আশ্রয়
আমার সত্তাকে জাগ্রত রেখেছি
জীবনের ক্লেদকে কতটা ঘৃণা করেছি
কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি
তোমাকে স্মরণ করেছি
এ ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝে সাগর পাড়ি দিয়ে
সৈকতে প্রার্থনা করেছি
এ জীবনকেই আবার পেয়েছি
বলতে পারো?

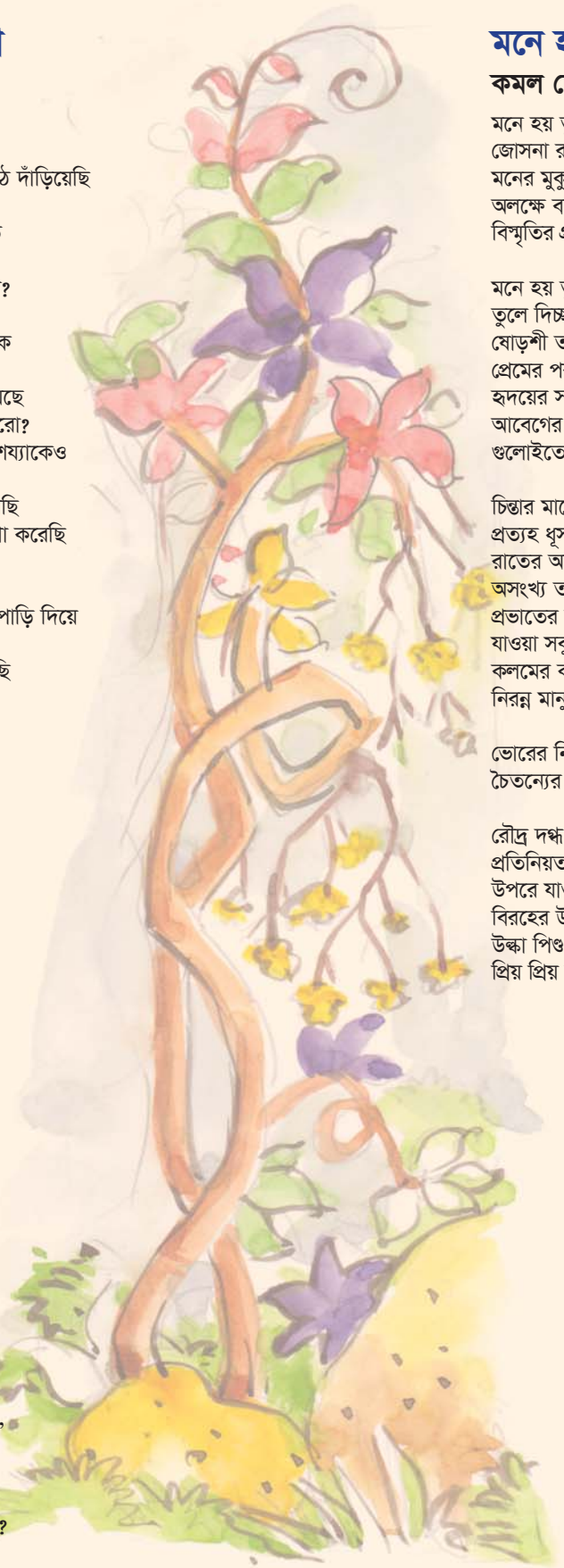

এ পথ বেয়েই

কল্পনা সরকার

সবুজ পাতার ঘন বনে
আদিমেরা সভ্যতা আনে
পাতার আবরণে।

মুনির সাথে আপন মনে
বুড়ো বট একই ধ্যানে!
ধ্যানের ফসল পাতায় লেখা,
পাতা থেকে পাথরে শেখা।
অতঃপর–কাগজে সভ্যতা!
বেদ উপন্যাস তত্ত্বসার
মুছে ফেলা সাধ্য কবে–কার?

মনে হয় তুমি

কমল চৌধুরী

মনে হয় তুমি বুকের মধ্যে এক নীল সমুদ্র
জোসনা রাতের অভিসারে চুমু খাওয়া ঠোঁট
মনের মুকুরে তুমি স্মৃতির
অলক্ষে বাজিয়ে তোল
বিস্মৃতির গ্রামোফোন রেকর্ড।

মনে হয় তুমি চোখের সামনে বসিয়ে
তুলে দিচ্ছ রূপের শরীর
ষোড়শী তন্বী অনুঢ়া তরুণী তুমি
প্রেমের পরশে বেড়ে ওঠা
হৃদয়ের সকল আশা।
আবেগের তীরে বাঁধা অসংখ্য কথার নৌকা
গুলোইতে বসে বলা সংলাপ।

চিন্তার মাঝে তুমি এক মধুর স্বপ্ন
প্রত্যহ ধূসর সৈকতে আঙুল ধরে হাঁটা প্রেয়সী
রাতের আকাশে তুমি
অসংখ্য তারা ঝিকিমিকি
প্রভাতের শিশির তুমি রাতের মিশে
যাওয়া সবুজ ঘাসের শরীর
কলমের কালি তুমি প্রতিনিয়ত লিখে যাওয়া
নিরন্ন মানুষের ভালোবাসার দুঃখ বিষাদ।

ভোরের নির্মল বায়ু তুমি এলিয়ে দুলিয়ে
চৈতন্যের গায়ে লাগা প্রেমের পরশ।

রৌদ্র দগ্ধ মাটি কাটা প্রশস্ত কোদাল তুমি
প্রতিনিয়ত পদ্মফুল আটকিয়ে আত্মচিৎকারে
উপরে যাওয়া শোকের ছায়া।
বিরহের উপাখ্যান তুমি আকাশের ঝরে পড়া
উল্কা পিণ্ড গহিন অরণ্যে নির্জনে একাকী
প্রিয় প্রিয় ডাকা বনের পাপিয়ার ডাক।

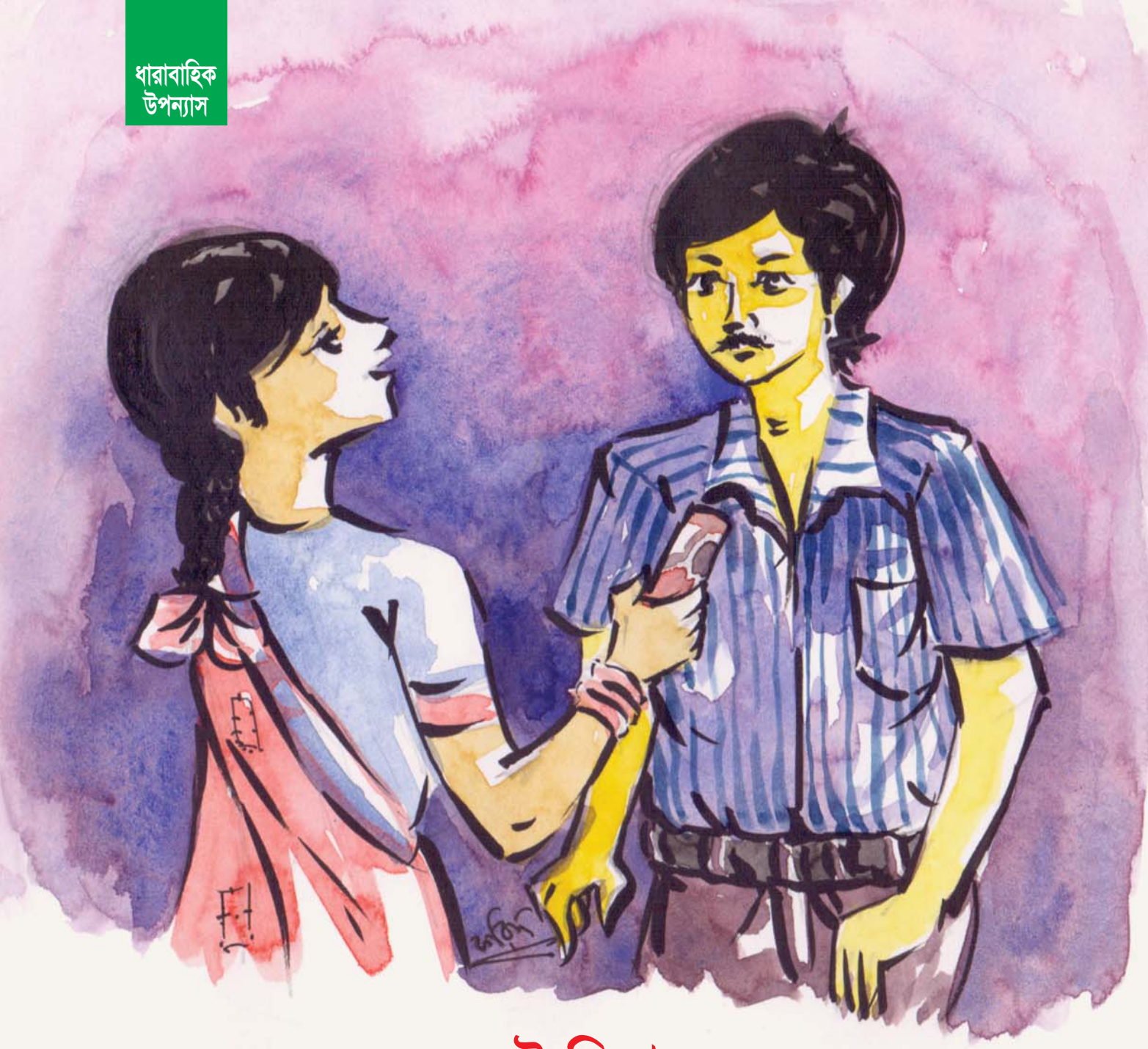

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

রাইসা নিরুদ্দেশের পর থেকে লম্বা নিম্নচাপের মতো থ ধরে আছে মালার চারপাশ। মেঘের মতো যেন স্থির হয়ে আছে গাছগাছড়ার বাগান। লতাপাতাদের কোনো নড়াচড়া নেই। মনে হচ্ছে হঠাৎ বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে প্রকৃতি।

এরমধ্যে আবার সমবয়সি শাশুড়িকে ডেকে পাঠিয়েছে খেয়া। ঘরের বাইরে খুব একটা যায় না মালা। শেকাবুর সাহেবের তা পছন্দও নয়। বিয়ের পরেই তাই বোরকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। মানুষজন বৃদ্ধের তরুণী বউকে দেখতে পায় না। বোরকার উপর থেকে যতটুকু বোঝা যায়, দেখে হাঁসফাঁস করে।

মালারও বোরকা পরতে হাঁসফাঁস লেগে যায়। তবুও পরে। যে জীবন– কর্তব্য আর অবরুদ্ধতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেখানে স্বাধীন নিশ্বাসের ভাবনাটাও বৃথা।

শেকাবুর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, খেয়া তোমারে ডাইকা পাঠাইল। নিজে আসতে পারল না?

-তাতে কী হইছে?

-শোনো, নিজেরে কোথাও হালকা হইতে দিবা না। তুমি কার বউ এইটা মাথায় রাখবা।

-তাইলে কি না যাওয়ার জন্য বলতেছেন?

-না যাও। একটু ঘুইরা আস। নাতিটারে দেইখা আস। দাদি হিসেবে কর্তব্য আছে তোমার।

কর্তব্যে একচুল ছাড় নেই মালার। চুলে খোঁপা করতে বসল সে। তারপর মাথায় হেজাব পরল। শেকাবুর সাহেব তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মালা থেকে দৃষ্টি সরানো তার জন্য একটু কষ্টকর। এই বৃদ্ধ বয়সেও যেন মনটা কেমন নেচে ওঠে। শেকাবুর সাহেবের হঠাৎ মনে হলো, পুরুষের বউ মরা খুব একটা খারাপ বিষয় না। একটা নতুন জীবন দেখা। বৃদ্ধ বয়সে নতুন চিন্তায় ব্যস্ত থাকা। মন্দ কী!

চুম্বকের মতো কঠিন শক্তি আছে মালার। সে শক্তির কাছে শেকাবুর সাহেব বারবার পরাজিত হতে ভালোবাসেন। মালা তার একক সম্পত্তি। মালার সাথে অন্য কারো হৃদ্যতা তার ভালো লাগে না। খেয়া কেন যে এত মালা ঘেঁষা। সৎ শাশুড়ি মালার জন্যে মায়ার শেষ নেই খেয়ার। এক সময় সাজিদের জন্যেও আদিখ্যেতার শেষ ছিল না। যৌথ পরিবারে থাকাকালীন আপন দেবরের মতো সাজিদকে সে খাতিরযত্ন করত। মনেপ্রাণে চাইত, সাজিদ স্কুলে যাক, লেখাপড়া শিখুক, মানুষ হোক। কিছু ব্যাপারে খেয়ার ভীষণ রকম বাড়াবাড়ি আছে। মালার ব্যাপারে সে প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে। বড়ো ছেলের বউ শান্তা এমনটি নয়।

বাড়াবাড়ি করা মানুষগুলোকে পছন্দ করেন না শেকাবুর সাহেব।

শেকাবুর সাহেব নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করেন। কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই মালার। কোনোকিছুতে নিস্পৃহ হতে বললে সময় নেয় না সে। তার পছন্দ-অপছন্দের কথা মালাকে বলে দিতে হয় না। প্রথম স্ত্রী সাকিবুন্নাহার এমন ছিলেন না। প্রচণ্ড ভয় পেতেন স্বামীকে। ভয় থেকে অনেক ভুলের উৎপত্তি। ভুলে ভুলেই জীবনটা পার করে দিয়েছিলেন সাকিবুন্নাহার।

শেকাবুর সাহেব আবার বললেন, কী জন্যে খেয়া তোমারে যাইতে বলছে জানি না। তবে তার সব ব্যাপারে সাপোর্ট দিবা না। শুনবা বেশি। বলবা কম। মনে রাখবা আমাগো কান দুইটা, বেশি শোনার জন্য। আর মুখ একটা। কম বলার জন্য। বুঝতে পারছ?

-জ্বী বুঝতে পারছি।

-আমার কথা মনে হয় তোমার পছন্দ হইতেছে না?

-কেন পছন্দ হবে না?

-হা-হু কিছু বলতেছ না যে?

-মুরুব্বিদের কথার মধ্যে কথা বলাতো ঠিক না।

-আমিতো খালি তোমার মুরুব্বি না। স্বামীও। স্বামীর সাথে এত চিন্তা কইরা কথা বলবা না। ভুল হইলে শুধরাইয়া দিবা। নিজেকে মালার স্বামী দাবি করার সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করেন না শেকাবুর সাহেব। অসুন্দর মানুষদের সেলফি তোলার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার মতো তিনি আবার বললেন, স্বামীর কাজে সব সময় সহযোগী থাকবা। স্বামীর মানসম্মান হইল স্ত্রীর মানসম্মান। আমি তোমার স্বামী। আমার ভুল মানে তোমার ভুল। বুঝতে পারছ?

-জ্বী বুঝতে পারছি।

-আর শোনো তোমার ভুল কিন্তু আমার ভুল। এমন কোনো কথা কোথাও বলবা না যাতে আমি ছোটো হইয়া যাই।

-জ্বী বলব না। তাইলে এখন অনুমতি দেন। আমি যাই।

-দাঁড়াও। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মুহূর্তেই মালার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। দূর কোনো অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ইচ্ছা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। মানুষ এত স্বার্থপর কেন! সে যাকে চায়। তার তাকে পেতেই হবে। অথচ তাকে কে চায়। সে জিজ্ঞাসার ধার কাছ দিয়েও হাঁটে না। মাঝে মাঝে শেকাবুর সাহেবকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বখাটেদের চেয়েও ঘৃণ্য লাগে মালার।

অনেক কষ্টেও যার চোখে কান্না আসে না, হঠাৎ চোখের ভিতরটা পানিতে ভরে গেল মালার। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, আপনি যাবেন, সে তো ভালো কথা। আমি খেয়ারে জানাইয়া দেই।

-জানানোর কী দরকার।

-আপনের আলাদা একটা আপ্যায়ন আছে না? আপনে গেলে সে না খাওয়াইয়া ছাড়বো না।

দীর্ঘসময় ছেলের বাসায় কাটানো শেকাবুর সাহেবের কাজ না। তার শরীরটাও ভালো নেই। বয়সজনিত অসুখবিসুখকে পাত্তা না দিয়ে উপায়ও নেই। বিকেলে বেরুতে হবে। কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সামনে নব্য হাজিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। তার আগে সাজিদকে দিয়ে দাওয়াত কার্ড বিলি করতে হবে।

শেকাবুর সাহেব শুয়ে পড়লেন। তার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। এক বেলা বিশ্রাম না নিয়ে পরের বেলা শ্রম দেওয়ার বয়স তার যে নেই। নতুন করে মনে পড়ল সে সত্যটা।

মালাকে বললেন, তুমি সাজিদরে নিয়া যাও।

মালার ভিতরের ময়ূরটা যেন পেখম মেলে ধরল। আজ তার স্বাধীন দিবস।

বাসা থেকে পায়ে হাঁটা পথ। পাশের গলিতে ঢুকতেই হাতের ডানে রাশেদের ফ্ল্যাটটা। চারতলায়। রানার ফ্ল্যাটটা একই বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায়। দু ভাইয়ে বনিবনা না হওয়াতে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে আলাদা বাসা ভাড়া নিয়েছে রানা। একটু দূরে। বাচ্চাদের স্কুলের পাশে। রিকশা-গাড়ি ছাড়া সেখানে যাওয়ার কায়দা নেই।

লিফট আছে। লিফটে উঠলে মালার প্রায়ই মনে হয়, লিফট ছিঁড়ে পরবে। সম্ভবতঃ খবরের কাগজে লিফট বিষয়ক দুর্ঘটনার খবর তার মনে এ সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।

সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল মালা। এত অল্প বয়সে এইটুকুতে হাঁপিয়ে ওঠার কোনো রহস্য সে বের করতে পারল না। বুড়োর বউ হওয়ার জ্বালা আছে। মানসিক বয়স বেড়ে যায় তরতরিয়ে।

মালা শরবত খেলো দু'গ্লাস। সাজিদকে কিছু খেতে বলেনি খেয়া। চেয়ে খাওয়া মানুষ সে না। নাতিকে নিয়ে মহানন্দে মেতেছে মালা। যেন তার বয়স বেড়ে গেছে বহুগুণ। এখন সত্যিই তাকে বয়স্ক দাদিমা মনে হচ্ছে।

সাজিদ বলল, আমার কাজ আছে। আমি যাই।

খেয়া কোনো কথা বলল না। অথচ খেয়ার কী মায়াটাই না ছিল সাজিদের উপর। শেকাবুর সাহেবের রক্তচক্ষুও যাকে দমাতে পারেনি।

কখনো কখনো কারো নিশ্চুপ থাকা যাবজ্জীবন দণ্ডের মতো মনে হয়। খেয়ার দিকে তাকালো সাজিদ। চেহারার অগোছালো ভাব, পোশাকের মলিনতা, চোখের নীচে লেপ্টে থাকা কালির আস্তরণ, সারা শরীরে যেন বিষ ঢুকিয়ে দিল সাজিদের। কী হয়েছে খেয়ার!

মালা জানত, সমস্যাটা ছোটো না। ছোটো সমস্যা হলে খেয়া নিজে

গিয়েই জানিয়ে আসত। তাকে ডেকে পাঠাত না। শেকাবুর সাহেব জানুক। এটাও খেয়ার চাওয়া নয়। বহুবার রাশেদের ব্যাপারে শ্বশুড়ের কাছে বিচার চেয়ে পায়নি খেয়া।

শেকাবুর সাহেব উল্টো বলেছেন, কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে স্বামীর নামে নালিশ করতে পারে না।

মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি শেকাবুর সাহেবের কাছে খেয়ার নালিশের বাণী নিভৃতে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছে বারবার। অথচ সাজিদের পান থেকে চুন খসতে পারে না। খড়গ হাতে বসে থাকেন শেকাবুর সাহেব। কিন্তু কেন? এ জবাব জানা নেই কারো। এরপরও কেন সাজিদ শেকাবুর সাহেবের পায়ের কাছে মাটি কামড়ে পরে থাকে, মাথায় আসে না খেয়ার।

কিছু না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল সাজিদ। পেট আর মন নিয়ে কখনো কোনো ভাবনা নেই তার। তাছাড়া কল্যাণ সমিতির কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। অনেক জায়গায় যেতে হবে। এমন অনেকেই আছে, চা না খাইয়ে ছাড়বে না তাকে। সাজিদের মাথা মাঝে মাঝে কাজ করে না, একটা শেকড়-বাকড়হীন ছেলের জন্য মানুষের এত মায়া কেন। সে দেখতেও তো সালমান খান জাতীয় কিছু না।

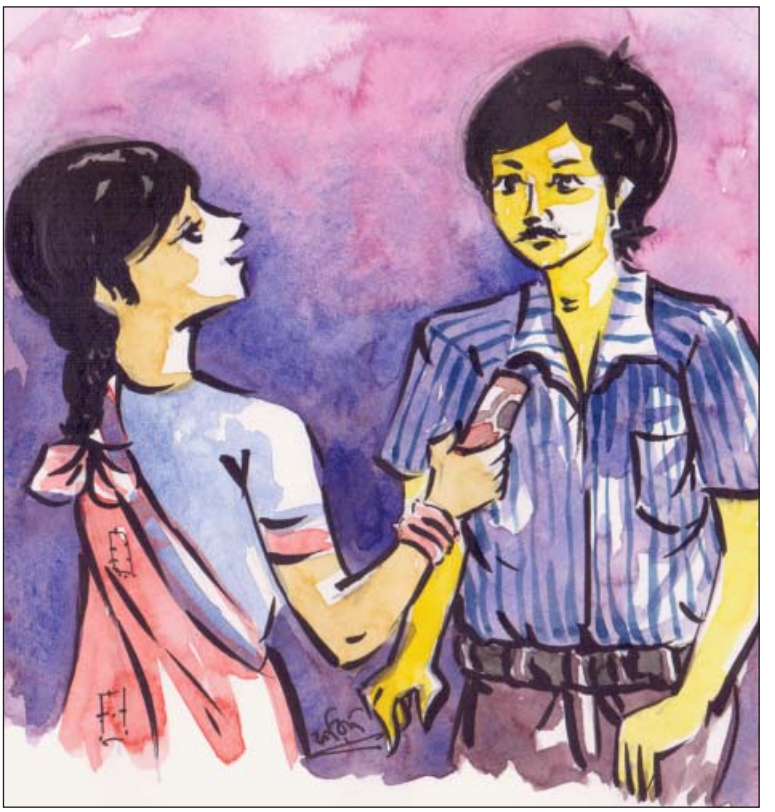

মাঝে মাঝে সাজিদের মনে হয়, এ দেশের অধিকাংশ মানুষের আসলেই কোনো আক্কেলবুদ্ধি নাই। কোন কাজটা করার, কোন কাজটা না করার, কোন কথাটা বলার, কোনটা না বলার, এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না অধিকাংশ মানুষ। ছাগলের মতো যা মনে হয় তাই করে, তাই চিবোয়।

আজকাল বেশ আকল আকল ভাব এসেছে সাজিদের। মালার প্রিয় পোষা বিড়াল রাইসাকে সে বস্তায় ভরে অনেক দূরে ফেলে দিয়ে এসেছে। অথচ কেউ তাকে এখন পর্যন্ত সন্দেহ করেনি। বরং মালার সন্দেহের তীরটা এখন পর্যন্ত মল্লিক সাহেবের দিকে। মল্লিক সাহেবের মাছ খেয়ে ফেলেছিল রাইসা। একবার দু'বার নয়। বেশ কয়েকবার। বিষয়টা মালার কানে বহুবার প্রচার করতে ভুল করেনি সাজিদ।

এত কসরত করে এসব কেন করেছে সাজিদ নিজেই জানে না ও। নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করেও উত্তর পায়নি। একেকবার মনে হয়, রাইসাকে খুঁজে এনে আবার মালার কোলে ফিরিয়ে দেবে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত চলে আসে। যা করেছে, তা শুধরাতে গেলে বিড়ম্বনাই বাড়বে কেবল। যা ঘটেছে। ঘটার মতো ছিল বলেই ঘটেছে।

কতগুলো দাওয়াত কার্ড নিয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সাজিদ। অন্যমনস্কভাব তার। কার্ডগুলো বিলি বাট্টা শেষ করে শেকাবুর সাহেবকে জানাতে হবে।

পাড়ার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এ বছর যারা হজ্ব করে ফিরেছে, তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে বেশ ঘটা করে। শেকাবুর সাহেব ওসিয়ত করেছেন, সামনের বছর স্ত্রীকে দিয়ে তিনি হজ্ব করিয়ে আনবেন। তার সংবর্ধনার ব্যবস্থাও বেশ ঘটা করে করা হবে। মালা খুশি না হয়ে যাবেই না।

কানে আসার পর থেকে বিষয়টা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না সাজিদ। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে, সংবর্ধনা নেওয়ার সাধ কতটুকু আছে মালার। একটা হারিয়ে যাওয়া বিড়ালের জন্য যার মন খারাপ হয়। হজ্ব করে এসে সংবর্ধনা নিতে তার কেমন আনন্দ হতে পারে।

একা একা কার্ড বিলি করতে মন সায় দেয় না। সাজিদ মনে মনে রিয়াদকে খুঁজতে লাগল। ছেলেটা বস্তির বারো নাম্বার ঘরের বাসিন্দা। বাপ-ছেলে মিলে দু'জন। পুরো পরিবার গ্রামে। তিন মেয়ে নিয়ে গ্রামে মায়ের বিশাল সংসার। সে সংসারের জোয়াল টানতে দিনরাত হাঁপড় টানতে হয় বাপ-বেটাকে।

সাজিদ মনে মনে আওড়ালো-একা একা এসব কামে জুইত আছে।

প্রায়ই এ সময়ে রিয়াদ চায়ের দোকানে কাটায়। পকেটে পয়সা থাকলে কখনো চা খায়। কখনো তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েদের যাওয়া-আসা দেখে। ইদানিং পাল্টে গেছে রিয়াদ।

ওর মামা থাকে সিংগাপুরে। কেঁদে কেটে মামার কাছ থেকে মোবাইল পেয়েছে রিয়াদ। তারপর থেকে ওকে দেখাই যায় না খুব একটা। কাজের সময়টুকু ছাড়া ঘরেই পরে থাকে। মোবাইল টিপে টিপে দিন পার করে দেয়। এখন মোবাইলই ওর জীবন। এরকম একটা সঙ্গীর বড়োই প্রয়োজন সাজিদের। কিন্তু কে তাকে এমন সার্বক্ষণিক সঙ্গী জুটিয়ে দেবে।

মালা নিজেই মোবাইল ব্যবহার করে না। তাকে তো এ যুগের মানুষ মনে হয় না। মোবাইলকে সে বলে শয়তানের বাক্স। এ যুগের ছেলেমেয়েদের নাকি জাহান্নামের চৌরাস্তায় পৌঁছে দিতে মোবাইলই যথেষ্ট।

রিয়াদকে ঘরে পাওয়া গেল। সে কাজে যায়নি। মোবাইলে ভিডিও দেখছিল। মনে হচ্ছে, প্রিয় কোনো ছবি। সাজিদের আগমন তার জন্য যেন শীতের রাতের প্রবল বাতাসের মতো বিরক্তি নিয়ে এসেছে। অনেক পরিশ্রান্ত ভাব নিয়ে সে বলল, শরীরডা বালো না। রেস্ট নিতাছি।

-কী হইছে তোর?

-জ্বর জ্বর লাগতেছে। রাইতে ঘুম হয় নাই।

-চাচায় কই? রাইতে ঘুমাস নাই, চাচায় ট্যার পায় নাই?

-আব্বায়তো বাড়ি গেছে ছুটি নিয়া।

-আর এই ফাঁকে তুই ভিড্যু দেখতাছস? তোর না জ্বর, চল আমার লগে। ঔষধ কিনা দিমুনে।

-আরে ধুর! ঔষধ আমার কাছেই আছে।

-তোর কাছে আছে!

-হ। মোবাইলে ভিড্যু দেখলে আমার শরীর-মন সব বালো হইয়া যায়। তুই দেখবি?

-অহন না। পরে দেখুম। কার্ড বিলি করা লাগবো। তুই আমার সাথে চল।

-মাথা খারাপ! আব্বায় বাড়ি গেছে। আমি কামে যামু একটু পরে। তুই যা।

-তোর চোখ লাল ক্যা?

-কইলাম না রাইতে ঘুম হয় নাই।

আর দীর্ঘ আলাপে যায় না সাজিদ। রিয়াদকে অপ্রকৃতস্থ লাগে। এর চেয়ে একাই কার্ড বিলি করা ভালো।

গলির ভাঙাচোরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার রিয়াদের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করল সাজিদ। কেমন ওলটপালট। বৈশাখি প্রলয়ে লণ্ডভণ্ড।

ভাঙা রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন পাথরের ছোটো ছোটো পাথর কুঁচি পা দিয়ে ফুটবলে লাথি মারার মতো দূরে ছুঁড়ে মারল সাজিদ। মনটা সত্যিই অস্থির তার। রিয়াদ কি বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে গেল!

কলিমুল্লাহ সাহেব বাসাতেই ছিলেন। নব্য হাজী মহোদয় কোনোরকমে হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলেন। নামটাও জিজ্ঞেস করলেন না সাজিদকে।

আলহাজ্ব মো: আতাহার আলিকে বাসায় পাওয়া গেল না। তার সহধর্মিনী আলহাজ্ব কোবরাতুন নেছা। সংবর্ধনার কার্ড পেয়ে সে মহাখুশি। ভদ্রমহিলা মায়ের মতো সাজিদকে সোফায় বসিয়ে পাশে নিজে বসে সুজির হালুয়া, ডিমের চপ খাওয়ালেন। জোর করে কামরাঙ্গার শরবতের গ্লাস হাতে তুলে দিলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সাজিদ। ভালো লাগায় মনটা আচ্ছন্ন। আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারলে ভালো লাগত। হাতের কার্ডের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল সাজিদ। দায়িত্ব তাকে দাঁড়াতে দেয় না। কোবরাতুন নেছা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আবার এস বাবা।

সারাদিন ধরে কার্ড বিলি করল সাজিদ। কিন্তু কোবরাতুন নেছার কথা 'আবার এস বাবা' ভুলতে পারল না। বার বার কানের কাছে রিনঝিনিয়ে বাজতে লাগল শব্দ তিনটি। কখনোতো এমনটি হয়নি। বিকল্প রাস্তা থাকার পরেও ফেরার সময় কোবরাতুন নেছার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে এসেছে সাজিদ। কোথাও দেখা মেলেনি ভদ্রমহিলার। সাজিদের মনে হলো, শুভ্র বর্ণের ওড়না দিয়ে মাথায় লম্বা ঘোমটা দেওয়া পুত: রমণী কোথায় যেন সে পূর্বে দেখেছে। কিন্তু কোথায়। সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না সে। মনটা তাই অস্থির। উত্তরটা আবিষ্কারের নেশায় বিভোর। কখন মিলবে উত্তর। কে জানে!

খেয়ার ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সাজিদ। একটু দূরে গলির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কার সাথে যেন কথা বলছে জয়নব। ছেলেটার গায়ে খয়েরি টি শার্ট। শার্টের কলার উঁচিয়ে আছে ঘাড়ের উপর। হাতে মোবাইল নেড়ে নেড়ে কথা বলছে ছেলেটা। জয়নব নিশ্চুপ।

বুকের কোথায় যেন দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে সাজিদের। জয়নবকে দেখলেই তার কলজেটা বড়ো রকমের একটা লাফ দিয়ে ওঠে। কারণটা সে ধরতে পারে না। পৃথিবীতে বোধ হয় অনেক কিছু এমনিতেই ঘটে। সব কাজের কারণ থাকে না।

বুকের উথালপাতাল নিয়েই লিফট বাদ দিয়ে সিঁড়ি ভাঙল সাজিদ। ধীর পায়ে কখন ফ্ল্যাটে ঢুকল টের পেল না।

খেয়া জিজ্ঞেস করল। এত দেরি করলি যে?

-অনেকগুলান কার্ড।

-হাজিদের বাড়ি গেলি, খেজুর খাইতে দেয় নাই?

-দিছে।

-তাইলে মুখটা এমন শুকনা ক্যান? শুকনা খেজুর খাইতে দিছিল?

টেবিলে নাস্তা দেখিয়ে মালা বলল, খা। দেরি করিস না।

-আমার খাইতে ইচ্ছা করতেছে না।

-ইচ্ছা না করলেও খাবি। কেউ খাইতে দিলে না খাওয়াটা অভদ্রতা।

যখন ভরাপেট, খাবারের কমতি হয় না তখন। খেয়ার উপর রাগ এল সাজিদের। এ বাসা থেকেইতো সে খালি পেটে বের হয়ে গিয়েছিল। আজব দুনিয়া। যেন অংকের ছকে বাঁধা। খালি থলেতে ভিক্ষে পরে না। ভরা থলে উপচে পরে।

ভালো করে খেয়াকে দেখল সাজিদ। মুখটা কেমন ফোলাফোলা। মনে হচ্ছে, মালাকে পেয়ে সে কেঁদেছে অনেক। মেয়েদের কান্নার কারণ খুঁজতে যাওয়াটা নাকি বেজায় বোকামি। কথাটা কার মুখ থেকে শোনা। রিয়াদ নাকি বদরুল। মনে পড়ছে না। আজকাল ভুলে যাওয়া রোগে ধরেছে তাকে।

বিদায়ের সময় মালা বলল, কোনোকিছু নিয়ে বেশি ভাববা না। যারা বেশি এটা করে, তারাই কিন্তু মরে। ব্যস্ত থাকবা বেশি বেশি।

সমবয়সি শাশুড়ির উপদেশ মন দিয়ে শোনে খেয়া। সত্যিই মালার ভেতরে তেজ আছে। শাড়ির আঁচল ধরে আছে নাতিটা। অনেক কষ্টে শাহজাদাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে নীচে নেমে এল মালা।

জয়নবকে আর কোথাও দেখা গেল না। এদিক-ওদিক অনেক খুঁজল সাজিদ।

মালা বলল, শাহজাদার জন্য মনটা কেমন করতেছে।

সাজিদ বলল, আমার মনটাও যেন কেমন করতেছে।

কারণটা বলল না সাজিদ।

(চলবে)

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাঙালি মুসলিম নারী মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার নাম বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। নারী স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির অভিপ্রায় নিয়ে তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী হিসেবে তিনি নিজেকে সারা জীবন ব্যাপৃত রাখেন, শুধু নারীর কল্যাণ চিন্তাকে মননে ধারণ করেন। মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা, অনন্য সৃজনী শক্তি, কঠোর কর্মনিষ্ঠা, উদ্যম ও ত্যাগে তিনি তাঁর জীবন ও সময়কালে পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বে উঠে সমাজের সকল বাধাবিপত্তিকে পেছনে ফেলে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন।

বেগম রোকেয়ার নাতিদীর্ঘ জীবন যেন এক কর্ম উদ্যোগী মানুষের অক্লান্ত সাধনা আর মানব কল্যাণে নিবেদিত অনন্য অসাধারণ মানবিক গুণে গুণান্বিত এক মহীয়সী নারীর কর্মপ্রয়াসের সমন্বিত রূপ। বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা প্রসার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর জীবনমান উন্নয়নে যেমন অসামান্য অবদান রেখেছেন, তেমনি তিনি সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবি সর্বপ্রথম বেগম রোকেয়াই উত্থাপন করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেগম রোকেয়া এ দাবি উত্থাপনের সাথে সাথে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, চারদিকে যেন নব আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে নারীর প্রতি যে অবিচার চলছে, বেগম রোকেয়া তা প্রথম দেখিয়ে দিয়েছেন। সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মানবিক গুণে অনন্য এই মহীয়সী নারী যে নারীমুক্তি আন্দোলন সূচনা করেন তাঁর সে আন্দোলনের মনোবল ও গতিশীলতা আজও নারীমুক্তি আন্দোলনে বহমান। মহীয়সী বেগম রোকেয়ার চিন্তা চেতনায় ও কর্মে শুধুমাত্র নারী নয়, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজজীবনের নানা বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি ও চিন্তা বিশ্লেষণে তিনি যে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনন্য।

ঘরে বন্দি নারী জাতির জন্য শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বেগম রোকেয়া যে শিক্ষার প্রদীপ হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে প্রদীপ তিনি আজীবন উত্থিত হাতে ধরে রেখেছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শিক্ষার আলো বিতরণ করে গেছেন, এটাকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

নারীমুক্তির দূত মহীয়সী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের, তিনি ছিলেন পায়রাবন্দের জমিদারির সর্বশেষ উত্তরাধিকারী। রোকেয়ার মায়ের নাম রাহাতুননেছা সাবেরা চৌধুরানী। তিনি ছিলেন ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার হোসেন উদ্দিন চৌধুরীর কন্যা। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন চতুর্থ। বেগম রোকেয়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। রোকেয়ার বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য তিনি গৃহপরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়ার বিয়ে হয়। সে সময় সাখাওয়াত হোসেন সাহেব ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। রোকেয়ার স্বামী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, কুসংস্কার মুক্ত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী। দুঃখের বিষয় যে, রোকেয়ার সংসারজীবন বেশি দীর্ঘ ছিল না। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে বেগম রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। বিবাহিত জীবনে রোকেয়া দুটি কন্যা সন্তানের মা হলেও অল্প বয়সেই সন্তানদ্বয় মারা যায়। ফলে রোকেয়ার স্নেহ বাৎসল্যের অবলম্বন ছিল না।

শিক্ষা ও সমাজ সেবায় রোকেয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ স্বামী সাখাওয়াত হোসেন টের পেয়েছিলেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রোকেয়াকে দশ হাজার টাকা দিয়ে যান। স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন। নিঃসঙ্গ রোকেয়া এ সময় নারী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাসের সময় ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া নিজেই ছিলেন স্কুলের হেড মিসট্রেস। ভাগলপুরে স্কুলটি বেশিদিন

পরিচালনা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্ল্যা লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নেন। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ নতুন করে স্কুল চালু করেন, ছাত্রী মাত্র আট জন, আর দুখানা বেঞ্চ সম্বল ছিল। ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগে স্কুলটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বছরের শেষ ভাগে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪ জনে। স্কুলটি ১৯১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ বারের মতো ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে সরিয়ে নেওয়া হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠায় রোকেয়া নিজে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যেমন সহ্য করেছেন, তেমনি নানা জনের কাছ থেকে সহযোগিতাও পেয়েছিলেন। একবার নববিবাহিত তরুণ-তরুণী তাদের বিবাহের সমস্ত যৌতুকের টাকা-পয়সা ও দ্রব্যসামগ্রী স্কুল উন্নয়নে আনন্দ চিত্তে দান করেন। স্কুলটি সরকারের সাহায্যও লাভ করে। ১৯১৭ সালে তৎকালীন বড়ো লাটপত্নী লেডি চেমসফোর্ড স্কুলটি পরিদর্শন করেন। তিনি রোকেয়ার শিক্ষা প্রসারে কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩১ সালে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পরিগণিত হয়।

রোকেয়া তাঁর জীবনের সকল শ্রম সাধনা এই স্কুলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যু তিনিই ছিলেন স্কুলের হেড মিসট্রেস ও সুপারিনটেনডেন্ট। নারী শিক্ষা যে নারীর অধিকার এ কথা বেগম রোকেয়া সব সময় বলতেন। তিনি আরো বলতেন, 'আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়– আমাদের জন্মগত অধিকার।'

জীবনভর তিনি ছিলেন কর্মোদ্যোগী ও নিষ্ঠাবান। অবসর বা বিশ্রাম বলে তাঁর জীবনে কিছু ছিল না। প্রতিটি মুহূর্ত সমাজের জন্য ব্যয় করেছেন। যদি একটু সময় পেয়েছেন সেই মুহূর্তটিতে তিনি হাতে কলম তুলে নিয়েছেন। সমাজের অসংগতি, অনাচার তথা নারীর প্রতি নিপীড়ন, অবিচার ইত্যাদি উঠে এসেছে তাঁর লেখায়, রূপ পেয়েছে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ।

নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম বিপুল না হলেও পরিমাণে একেবারে কম নয়। মূলত প্রবন্ধ রচনা করলেও তিনি উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা লিখেছেন, লিখেছেন কবিতাও।

বেগম রোকেয়ার প্রথম রচনা 'পিপাসা' শীর্ষক প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় ও হরেন্দ্র লাল রায় সম্পাদিত মাসিক *নব প্রভা* পত্রিকার ১৩০৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে বেশি খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।

বেগম রোকেয়া প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– *মতিচূর, সুলতানাস ড্রিম, পদ্মরাগ, অবরোধ বাসিনী*। *মতিচূর* দুই খণ্ডে প্রকাশিত। *সুলতানাস ড্রিম* মূল ইংরেজি থেকে বেগম রোকেয়া নিজে অনুবাদ করেন *সুলতানার স্বপ্ন* নামে। *পদ্মরাগ* উপন্যাস। *অবরোধ বাসিনী* মহিলাদের অবরোধের বিষয়ে বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত করুণ নির্মল হাস্যরসের মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থই সাহিত্য শিল্প গুণে উৎকৃষ্ট।

রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, সামাজিক সংস্কার বা রূপান্তর সাধন। নারী সমাজের জাগরণ আর কল্যাণ চিন্তায়ই তিনি মগ্ন ও নিবেদিত ছিলেন।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা ছাড়াও আছে কবিতা। অবশ্য কবিতা মাত্র কটি। বহুল আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'প্রভাতের শশী', 'পরিতৃপ্তি', 'স্বার্থপরতা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'বাসিফুল', 'শশধর', 'ভ্রাতাভগ্নী', 'সওগাত' ও 'নিরূপম বীর'।

'প্রভাতের শশী', 'পরিতৃপ্তি', 'স্বার্থপরতা' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-এই চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে গিরিশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত *মাসিক মহিলার* যথাক্রমে– বৈশাখ ১৩১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, আষাঢ় ১৩১১ ও পৌষ ১৩১১ সংখ্যায়।

'বাসিফুল', 'শশধর', 'ভ্রাতাভগ্নি'–এই তিনটি কবিতা সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত *মাসিক নবনূর*-এর যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩১০, চৈত্র ১৩১০, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সারল্য ও সহজবোধ্যতা বেগম রোকেয়ার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশ, প্রকৃতি, চাঁদ, ফুল ইত্যাদি বেগম রোকেয়ার কবিতার বিষয়াবলিতে স্থান পেয়েছে। সৃষ্টি কুশলতা ও ছন্দ মাধুর্য্যে বেগম রোকেয়ার কবিতা অনবদ্য ও হৃদয়স্পর্শী। ভাষার সহজ সরল অনাড়ম্বর রূপের মধ্যেও যে অসাধারণ কাব্যময়তা আছে, বেগম রোকেয়ার এই কবিতাটি পাঠে তা হৃদয়ঙ্গম হয়। বেগম রোকেয়ার কবিতায় উদার মানবিকতা, স্বাধীনতা প্রীতি ও সমাজ চিন্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে, ফুটে উঠেছে মননশীল গভীর চিন্তার দীপ্তি।

সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়েও তিনি নারীমুক্তির কথা বলেছেন। আমৃত্যু তিনি নারীমুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ৫২ বছর বয়সে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী জাগরণে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

তথ্যপুঁজি

ফারিহা রেজা

সমাজে তথ্যপুঁজির গুরুত্ব বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঠিক তথ্য ভোক্তা শ্রেণির কাছে কতখানি নির্ভরযোগ্য হবে তা নির্ভর করছে তথ্য পুঁজিপতিদের ওপর। ব্রিটেনের খ্যাতনামা টেলিভিশন উপস্থাপক জোনাথান ডিম্বলবাইয়ের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তথ্যপুঁজির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য– তথ্যপ্রযুক্তি দাক্ষিণ্যে আমরা যত বেশি, ভালো জানার সুযোগ পাচ্ছি, ততই বাড়ছে আমাদের আরো কম মানুষের কাছ থেকে আরো অল্প জানার বিপজ্জনক সম্ভাবনা।

তথ্যের জন্য পৃথিবীতে যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, খবরের জন্ম দিচ্ছে তারাই। সারা দুনিয়ার তথ্য প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই। উল্লেখ্য, আমেরিকার ইরাক আক্রমণের বিভিন্ন সংবাদচিত্র যেভাবে আল-জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করেছে তা একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত।

ইতিহাস কথা বলে? কথায় বলে ইতিহাস তারাই লেখেন বা লেখান যারা পুঁজিকে, ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাস বিকৃতির অন্যতম রূপ তথ্য সন্ত্রাস। আজকের দুনিয়ায় মানবতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং আইন অমান্যকারীরাই বড়ো মাত্রায় তথ্যপুঁজি তথা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক। মানবতাবিরোধী কর্মযজ্ঞে নায়কের ভূমিকায় তারাই দৃশ্যমান।

কার তথ্যপুঁজি কতখানি সমৃদ্ধ তার ওপর নির্ভর করছে আধিপত্য বিস্তার। নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যায়ে গ্লোবালাইজেশন ধারণাটি পূর্ণতা পায়। গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে পাশের দেশ অন্য গ্রাম। পাশের গ্রামের চিত্রটি সঠিকভাবে ভোক্তাশ্রেণি পাবে কি-না তা পুরোপুরি নির্ভর করছে তথ্যপুঁজির মালিকদের ইন্টারেস্ট বা উদ্দেশ্য পূরণের ওপর।

Interpersonal Communication বা আন্তঃব্যক্তির যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। গোটা বিশ্বের বাসিন্দারা আজ একে অন্যের সঙ্গে অনেক বেশি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে ভাব চিন্তা-চেতনা ও তথ্য পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যমে। সেই অর্থে পণ্য ও সেবা সামগ্রীর আদান-প্রদানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্যপুঁজির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেবা পণ্যের জাতীয় বাজার আজ আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হয়েছে। 'Information is money' বিশ্ব বাজারে তথ্যপুঁজি অন্যান্য পণ্য সমগ্রীর চেয়ে বেশি মাত্রায় লেনদেন হচ্ছে। তথ্যপুঁজি উৎপাদনের উপাদানই নয়, নিজেই পণ্য। কারণ এর রয়েছে ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য। এই সামগ্রী ও পরিসেবা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে। পুঁজিপতিরাও খুব ভালোভাবে জ্ঞাত আছে– বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির সবচেয়ে গতিশীল মুনাফাজাত খাত হচ্ছে তথ্যপুঁজি। এর বিনিয়োগের ফলে বাড়ছে কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান।

সত্তর দশকে তথ্যপুঁজি লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত গ্লোবাল সিটিগুলো নিউইয়র্ক ও লন্ডনের সঙ্গে হংকং, টোকিও ও সিঙ্গাপুর। উল্লেখিত শহরগুলোর প্রধান বাণিজ্য তথ্যপুঁজির লেনদেন করা বা তথ্যের যোগান দেওয়া।

বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটার ফলে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে বদলে যাচ্ছে সমাজব্যবস্থা, জন্ম দিচ্ছে নতুন ধ্যান-ধারণা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটে ১৯৬০-এর দিকে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন বা নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার NIDL গড়ে উঠার পর। কিন্তু তখনো বৈশ্বিক অর্থনীতি (Globalized Economy) বিকশিত হয়নি। এই ধারণাটি পূর্ণতা পায় তথ্যপুঁজি পুরোমাত্রায় বিকাশ লাভের ফলে।

তবে তথ্যপুঁজির ক্ষেত্রে, কেউ বর্তমানে একক মালিকানা বা একচেটিয়া বাণিজ্য করতে পারছে না। একাধিক প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা ও ঐক্যের মধ্যদিয়ে সবাই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। তবে বাজার ও তথ্যপুঁজির উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করছে বড়ো পুঁজিপতিরাই।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আদায়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। দেশ ও জনগণের কল্যাণে আমাদের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আদায়ে জনগণকে সচেতন হতে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

হবে। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয়। তাই তথ্যপ্রাপ্তিতে জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, তথ্য জানা আর না জানা অনেকটা আলো-আঁধারের মতো। আলো যেমন মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ দেখায়, তেমনি তথ্য মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অনাচার দূর করার পথ দেখায়। পক্ষান্তরে আঁধার মানুষকে অমঙ্গলের পথে নিয়ে যায় এবং তথ্যের অপর্যাপ্ততা সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটায়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ গণতন্ত্র ও সুশাসনের চালিকাশক্তি। তথ্যের প্রবাহের সঙ্গে আর্থসামাজিক উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যে-কোনো রাষ্ট্রে তথ্য যত সহজলভ্য তার উন্নয়নের মানও তত বেশি।

তিনি আরো বলেন, জনকল্যাণে তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রে দুর্নীতির যাত্রাকেও ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে। এর ফলে সাধারণ জনগণই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়।

তিনি বলেন, সহজে ও সুলভে সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি প্রত্যেক মানুষের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। সঠিক তথ্য অমূল্য সম্পদ। তথ্য মানুষকে সব সময় সচেতন করে ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তথ্য জানার অধিকার মানুষের অন্যতম মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। সরকার জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আরটিআই বিধি প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি দূর করা। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

গোয়ায় আউটরিচ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ অক্টোবর ভারতের পর্যটন নগরী গোয়ায় ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য যান। গোয়ায় পৌঁছলে বিমানবন্দরে তাঁকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর, গোয়া সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী এলিনা সালদানহা ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ্ম জইসওয়াল প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁকে গোয়ায় হোটেল দ্য লীলায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। প্রধানমন্ত্রী ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সামিটে ভাষণদানকালে ব্রিকস-বিমসটেক-এর নেতৃবৃন্দকে একই টেবিলে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ব্রিকস-বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর টেকসই উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সংস্থা দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় এই দুই সংস্থার সদস্য দেশগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী সংস্থা দুটির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট ৩টি পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দেন। পরামর্শগুলো– ১. মানসম্পন্ন ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া ২. প্রযুক্তির জন্য বৃহত্তর সহযোগিতা চালু ৩. স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সংলাপের প্রক্রিয়া শুরু করা। তিনি ব্রিকস কাঠামোর অধীনে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর সম্ভাবনার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য ব্রিকস দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ব্রিকস ও বিমসটেক নেতাদের সম্মানে দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৭ অক্টোবর সকালে দেশে ফিরে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ অক্টোবর ২০১৬ ভারতের গোয়ায় ব্রিকস-বিমসটেক শীর্ষ নেতাদের আউটরিচ সামিটে অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি

বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ অক্টোবর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক যৌথ ভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রয়াসে বিশ্বব্যাংককে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে মনে করে বাংলাদেশ। তিনি ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাংক আরো বেশি এগিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা করেন এবং বিশ্বব্যাংক নয়, আন্তর্জাতিক সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির তাগিদও দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক টেকনোলজি পার্কসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এছাড়া নতুন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি অর্জনে সরকার কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

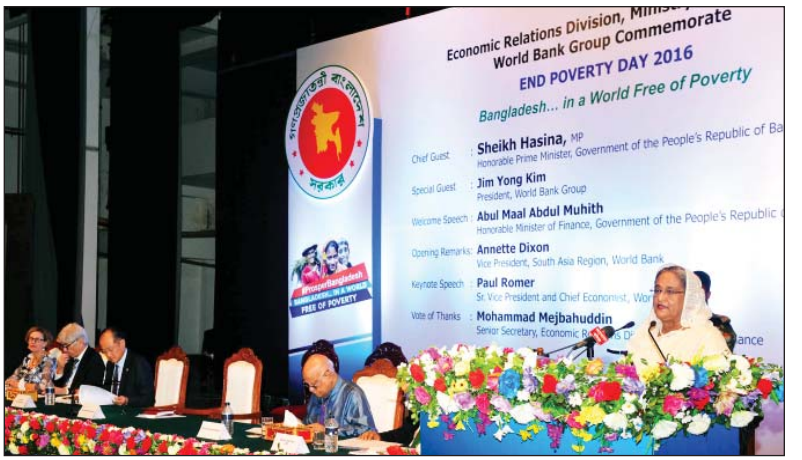

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ অক্টোবর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শেখ রাসেল-এর ৫২তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত শিশু সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ এ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী ছোটো ভাই শেখ রাসেলের কথা স্মৃতিচারণ করেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে। তিনি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিশুদের মন দিয়ে লেখাপড়া করার এবং আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশের শিশুদের মাঝে নিজের হারানো ছোটো ভাই রাসেলকে দেখতে পান এবং তাদের জন্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চান বলেও উল্লেখ করেন। তিনি শিশুদের উদ্দেশে বলেন, 'এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার তোমরা। তোমাদের মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কথা শুনতে হবে'। এছাড়া শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবনযাপন এবং জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে দূরে থাকতে শিশুদের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের একটা মানুষও ক্ষুধার্ত থাকবে না, গৃহহারা থাকবে না, প্রতিটি শিশু স্কুলে যাবে, পড়াশোনা করবে, নিজেদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাবে– সেই ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাটাই আমার লক্ষ্য'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ অক্টোবর ২০১৬ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও এসএসসি পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন –পিআইডি

তথ্যপ্রযুক্তি মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ অক্টোবর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় দেশের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি মেলা 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬'–এর উদ্‌বোধন করেন। 'নন স্টপ বাংলাদেশ'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সরকারের আইসিটি বিভাগ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় তিনদিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করা হয়। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে কেউ যেন অপরাধ কার্যক্রম চালাতে না পারে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে আর্থিক খাত এবং গোপনীয় বিষয়ের নিরাপত্তা যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেই বিষয়েও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন।

চিকিৎসা সেবায় বিত্তবানদের অনুদান নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ অক্টোবর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনদের ত্রয়োদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের অভিনন্দন জানান এবং চিকিৎসকদের সততা ও মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে অনুদান নিয়ে এগিয়ে আসারও

আহ্বান জানান। পরে তিনি ফেলোদের হাতে সনদ ও সোনার পদক তুলে দেন।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন প্রকল্পের উদ্‌বোধন

শিশুদের সুরক্ষায় '১০৯৮' হেল্পলাইন, বাগেরহাটের মংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন শস্য ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো এবং খননকৃত মংলা-ঘষিয়াখালী নৌ-চ্যানেল ও এর ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ২৭ অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই তিনটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুটি আইন-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ অক্টোবর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী উন্নতমানের গম, ভুট্টা ও পাটের জাত উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহ দিতে 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬' এবং 'বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬'- এর খসড়ার অনুমোদন দেন।

যুবসমাজ দেশের প্রাণ ও চালিকাশক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় যুব দিবস' উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুবক, যা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। তারা দেশের প্রাণ ও চালিকাশক্তি।' তাই যুবসমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থেকে নিজের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি যুবকদের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং দেশের সব জেলায় যুবকদের জন্য একই ধরনের প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। পরে ১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সমাজ ও রাজনীতিকে জঙ্গির দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক হনু ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি ক্লাবে *হালদার হাসি* চলচ্চিত্রের মহরত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, সমাজ ও রাজনীতিকে জঙ্গির দূঘণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, নদী ও পরিবেশকে বর্জ্যের দূষণমুক্ত এবং সমাজ ও রাজনীতিতে জঙ্গির দূষণমুক্ত রাখতে হবে। বর্জ্য যেমন নদী ও পরিবেশকে দূষিত করে তেমনি জঙ্গিবাদ দূষিত করে রাজনীতি ও সমাজকে। সুস্থ, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবনের জন্য এ দূষণমুক্তির বিকল্প নেই।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৫ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয় যুব জোট আয়োজিত জঙ্গিবাদ বিরোধী মানববন্ধনে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

জঙ্গিবাদ এবং সাইবার অপরাধ গণতন্ত্রের বড়ো শত্রু

তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে সফররত আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই)-এর নির্বাহী পরিচালক বারবারা ত্রিয়োনফি (Barbara Trionfi) ২৫ সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তথ্যমন্ত্রী দেশের গণমাধ্যমের প্রসার ও কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন, সাংবাদিকদের কল্যাণে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও প্রবর্তন, সংবাদপত্র এবং অনলাইন সংবাদ পোর্টাল সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এদেরকে গণমুখী করে তোলা এবং গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী আরো বলেন, জঙ্গিবাদ এবং সাইবার অপরাধ গণতন্ত্রের বড়ো শত্রু। অপরদিকে গণমাধ্যম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গণতন্ত্রের সহায়ক স্বচ্ছতা আনয়নকারী। সে বিশ্বাস থেকেই বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

দখল-দূষণমুক্ত নদী টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য

তথ্যমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব নদী দিবস ২০১৬' উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে নোঙর আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী 'গণমাধ্যমকর্মীদের নদনদীর আলোকচিত্র প্রদর্শনী' উদ্‌বোধনকালে বলেন, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিমুক্ত রাজনীতি এবং দখল-দূষণমুক্ত নদী দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

তিনি বলেন, অবৈধ দখল ও বর্জ্য নদী দূষণ করে আর সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ দূষণ করে রাজনীতি। টেকসই উন্নয়ন করতে হলে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী এবং রাজনীতি উভয়কেই দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

বর্তমান বিশ্ব দারিদ্র্য পরিবেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জঙ্গি-সন্ত্রাস বিষয়ে সমাধান ও উত্তরণে কাজ করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশও এ চারটি বিষয়ে কাজ করে চলছে। লোভ, ভোগ আর মুনাফার প্রবৃত্তি– এই তিন থেকে মুক্তিই এই চারটি বিষয়ে সাফল্য এনে দিতে পারে। তিনি এ সময় দখল, দূষণ ও অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণকে দেশের নদনদীর প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমকে এই বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি

সরকার ৩১ অক্টোবর ২০১৬ এক প্রজ্ঞাপন জারির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যেসকল মুক্তিযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন, সে সকল খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিপত্রে এ ভাতা ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর হবে। প্রেক্ষিতে–

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার মাসিক সম্মানী ভাতা

বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য মাসিক ৩০ হাজার টাকা, বীর-উত্তমদের জন্য মাসিক ভাতা ২৫ হাজার টাকা, বীরবিক্রমদের জন্য মাসিক ভাতা ২০ হাজার টাকা এবং বীরপ্রতীকদের জন্য মাসিক ভাতা ১৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ করেছে।

অন্যদিকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে 'এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতা ৩০ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা ৮ হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ৪৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

'বি' শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৮ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা ৮ হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ৩৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

'সি' শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৩ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা ৮ হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

'ডি' শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ ১৮ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা ৮ হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৩ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা আট হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতার পরিমাণ ১৮ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা আট হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে ।

অন্যদিকে বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের মাসিক ভাতা ২৮ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার টাকা, সাহায্যকারী ভাতা ৮ হাজার টাকা, খাদ্য ভাতা ৫ হাজার টাকাসহ মাসিক ভাতা ৩৫ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের এবং কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধান অনুযায়ী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

প্রতিবেদন : আসিফ রহমান

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

১ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে আন্তর্জাতিক 'প্রবীণ দিবস'

জাতীয় স্যানিটেশন মাস

❑ জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতো এবারো 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৬' পালন করা হয় নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে

গণভবনে সংবাদ সম্মেলন

২ অক্টোবর : গণভবনে আয়োজিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন

স্মার্টকার্ড বিতরণ উদ্‌বোধন

❑ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) আয়োজিত স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ

৩ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ অক্টোবর ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত স্মার্ট কার্ড জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন শেষে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়ারদের হাতে স্মার্ট কার্ড জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দেন –পিআইডি

সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'থাকবে শিশু সবার মাঝে ভালো, দেশ-সমাজ, পরিবারে জ্বলবে আশার আলো'

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

❑ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কোনো শিশু যেন খাওয়ার কষ্ট না পায় এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

মন্ত্রিসভার বৈঠক

❑ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ' আইন অনুমোদন লাভ করে

বিশ্ব বসতি দিবস পালিত

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বসতি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'Housing at the Centre'

একনেকে আট প্রকল্প অনুমোদন

৪ অক্টোবর : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রায় ৯২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যাত্রীবাহী কোচ কেনাসহ আট প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে

জাতীয় দক্ষতা ও উন্নয়ন কাউন্সিল সভায় প্রধানমন্ত্রী

৫ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় দক্ষতা ও উন্নয়ন কাউন্সিলের চতুর্থ সভার উদ্‌বোধনী বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিসি) পূরণে সংশ্লিষ্টের কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

❑ শিক্ষকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা ও পেশাগত উৎকর্ষতা উন্নয়নের অঙ্গীকারে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে সারা দেশে পালিত হয় 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'শিক্ষকের মূল্যায়ন, মর্যাদার উন্নয়ন'

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী

৮ অক্টোবর : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে লালবাগের ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ধর্মের নামে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বরদাশত করা হবে না। এদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের স্থান হবে না

তামাকমুক্ত দিবস

৯ অক্টোবর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহত করতে প্রয়োজন এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন'

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১০ অক্টোবর : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান যাচাইয়ে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৬ খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেন

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত

❑ 'মানবিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ: সবার জন্য প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা'– প্রতিপাদ্য সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'

স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস

❑ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'স্তন ক্যানসারে সচেতনতা দিবস'

উৎসবে-আনন্দে সমাপ্ত শারদীয় দুর্গোৎসব

১১ অক্টোবর : দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হয় পাঁচদিনব্যাপী সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব

পবিত্র আশুরা

১২ অক্টোবর : সারা দেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'পবিত্র আশুরা'

বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস'

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

১৩ অক্টোবর : সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'লিভ টু অল'। এর সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশে দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয় 'দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে হলে, কৌশলসমূহ বলতে হবে'

দুর্যোগ প্রশমন দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

❑ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৬' উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে-কোনো দুর্যোগ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'সবাই মিলে কাজ করি, অন্ধত্ব দূর করি'

ঢাকায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

১৪ অক্টোবর : চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাংলাদেশে দুদিনের

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪ অক্টোবর ২০১৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গণচীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-কে স্বাগত জানান –পিআইডি

রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ চীনের প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই নেতার আনুষ্ঠানিক বৈঠক এবং ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক শেষে গণমাধ্যমে যুক্ত বিবৃতি দেন শি জিনপিং ও শেখ হাসিনা

বিশ্ব মান দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিএসটিআই-এর উদ্যোগে 'বিশ্ব মান দিবস' পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'মান আস্থা সৃষ্টি করে'

বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস

১৫ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস'

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদ্‌যাপিত

❑ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ি'

ভারতে ব্রিকস-বিমসটেক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

১৬ অক্টোবর : ব্রিকস-বিমসটেক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের গোয়া পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নয়নের পথে একে অন্যের পাশে থাকবে বাংলাদেশ ও ভারত। ভারতের গোয়ায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোয়ায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস–বিমসটেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ভাষণকালে টেকসই উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ব্রিকস এবং বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান

বিশ্ব খাদ্য দিবস

❑ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য এবং কৃষিও বদলাবে'

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস

১৭ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'বঞ্চনা থেকে অংশীদারিত্বে পদার্পণ : সব ধরনের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি'

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট

❑ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রয়াসে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক আরো জোরালো ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম একই অনুষ্ঠানে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য সারা বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয়, অন্যদের জন্য অনুসরণীয়

স্কাউটদের প্রতি রাষ্ট্রপতি

১৮ অক্টোবর : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটদের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সবাইকে বিশেষ করে স্কাউটদের মাদকের অপব্যবহার ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান

শেখ রাসেলের জন্মদিন উদ্‌যাপিত

❑ রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করে

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উদ্‌বোধন

১৯ অক্টোবর : বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে দেশের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি মেলা 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৬' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২০ অক্টোবর : জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ৩১ তলাবিশিষ্ট 'জাতীয় প্রেস ক্লাব বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কমপ্লেক্স'- এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২ অক্টোবর : নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'দোষারোপ নয়, দুর্ঘটনার কারণ জানতে হবে, সবাইকে নিয়ম মানতে হবে'। **প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রবৃদ্ধিতে নতুন মাইলফলক

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশে অতিক্রম করেছে। গত অর্থবছরে (২০১৫-১৬) বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭ দশমিক ১১ শতাংশ। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে,

যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রাক্কলিত হিসাবের চেয়ে বেশি। নয় মাসের (জুলাই '১৫ – মার্চ '১৬) তথ্য বিশ্লেষণে বলেছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭.৫ শতাংশ অর্জন করবে। কিন্তু অর্জন আরো বেশি। কয়েক বছর প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ঘরে আটকে থাকলেও সেবা ও শিল্প খাতের ওপর ভর করে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। শিল্প খাতে ১১.০৯ এবং সেবা খাতে ৬.২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছ রপ্তানিতে আয় কোটি টাকা

মাছ বাংলাদেশের প্রোটিনের প্রধান উৎস। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে আজ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে মাছ রপ্তানি করতে পারছি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে হিমায়িত ও জীবিত মাছ রপ্তানিতে আয় হয়েছে ১৩ কোটি ৬৭ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ৭৪ কোটি টাকা। এরমধ্যে শুধু চিংড়ি রপ্তানিতে আয় হয়েছে ১২ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৭৭ কোটি টাকা। যা মোট মাছ রপ্তানির প্রায় ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এ খাতে আয় হয়েছিল ২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়ল

খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি করেছে সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা ২০১৬'-এর খসড়ায় এ প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকার। এ নীতিমালায় বীরশ্রেষ্ঠ ভাতা ১২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। বীর-উত্তমদের ভাতা ১০ হাজার টাকা এবং বীর-প্রতীকদের মাসিক ভাতা ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়া এ শ্রেণির পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ৩০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫ হাজার টাকা, বি শ্রেণির পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা, সি শ্রেণির ১৬ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং ডি শ্রেণির পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ৯ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

শহিদ পরিবারের সদস্যদের মাসিক ভাতা মাসে ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ১৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ভাতা ২৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে চার পর্যায়ের খেতাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে সেই চার খেতাবের নামকরণ হয় বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক। সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ পান ৭ জন। এছাড়া ৬৮ জন বীর-উত্তম, ১৭৫ জন বীরবিক্রম এবং ৪২৬ জন বীরপ্রতীক

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

খেতাব পান। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

নারী-পুরুষ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ

নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় গত বছরের শীর্ষ অবস্থানটি এবারো ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে লৈঙ্গিক ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে চলতি বছর বাংলাদেশের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। তবে, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো ব্যবধান রয়েছে। সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় অবস্থান ভারতের আর সবচেয়ে নিচের অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান।

নারী-পুরুষ ব্যবধান কমিয়ে সমতা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ক সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) প্রকাশ করে থাকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। বিশ্বের ১৪৪টি দেশের শিক্ষাগত সাফল্য, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন–এ চারটি মূল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায় যেমন অগ্রগতি হয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

ছায়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন টিউলিপ

যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভায় (শ্যাডো কেবিনেট) শিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। সম্প্রতি লেবার দলের শিক্ষা বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী অ্যাঞ্জেল রেইনার এ নিয়োগের কথা ঘোষণা দেন।

যুক্তরাজ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য সরকারের বিপরীতে বিরোধী দলও একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে। এটিকে বলা হয় ছায়া মন্ত্রিসভা। ছায়ামন্ত্রীদের কাজ হলো সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ভুলত্রুটি তুলে ধরে চ্যালেঞ্জ করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ ২০১৫ সালে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসন থেকে লেবার দলের এমপি নির্বাচিত হন।

যুক্তরাজ্যে ছায়ামন্ত্রী হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রূপা হক

রূপা হক

যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভার (শ্যাডো কেবিনেট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক ছায়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি রূপা হক। সম্প্রতি লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন তাকে এ পদে নিয়োগ দেন। রূপা ছায়ামন্ত্রী ডায়ান অ্যাবোটের নেতৃত্বে কাজ করবেন।

রূপা হক ২০১৫ সালে লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন আসন থেকে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন। তার আদি বাড়ি পাবনা শহরের মকছেদপুরে।

ওয়ার্ল্ড মেরিট সংস্থায় বাংলাদেশের সাজিয়া

বৈশ্বিক দারিদ্র্য মুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড মেরিট' সংস্থায় অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে সাজিয়া আফরিন স্বর্ণা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছয় হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এ গৌরব অর্জন করেন।

মার্কেটিং-এ বিবিএ সম্পন্ন করা এ তরুণী বৈশ্বিক দারিদ্র্য মোকাবিলার পাশাপাশি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যও কাজ করছেন। এ লক্ষ্যে 'ইভলভিং বাংলাদেশ' নামে একটি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। এতে ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষুকদের যোগ্যতা মতো কাজ শেখানো হবে, যাতে তারা নিজেরাই আয় করতে পারে। এতে ক্রমান্বয়ে দেশের সবার কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। সাজিয়া ২০১৩ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অ্যাকটিভ সিটিজেন লিডারশিপ পুরস্কার লাভ করেন।

বিশ্বের ১৭ যুব নেতার তালিকায় সওগাত নাজবিন

বিশ্বের ১৭ যুব নেতার তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে সওগাত নাজবিন। জাতিসংঘ সদর দপ্তর ঘোষিত এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সওগাত নাজবিন

এই যুব নেতারা জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশ নেবে। এ কর্মসূচিতে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে তারা প্রচেষ্টা চালাবেন। তারা জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পেও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

এসব যুবরা ইতোমধ্যে দারিদ্র্য নিরসন, বৈষম্য রোধসহ বিভিন্ন কাজে তাদের সফলতার সাক্ষর রেখেছেন।

পর্তুগালের বর্ষসেরা নারী মারিয়া কন্সিসাও

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে পর্তুগালের বর্ষসেরা নারী নির্বাচিত হয়েছেন মারিয়া কন্সিসাও। পর্তুগিজ এই সমাজকর্মী ঢাকার বস্তির শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন।

২০০৫ সাল থেকে ঢাকার সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসীদের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করছে মারিয়া ক্রিস্টিনা ফাউন্ডেশন। মারিয়ার নেতৃত্বেই চলে ফাউন্ডেশনটি। এই পর্যন্ত ১৭২জন বস্তিবাসী শিশুকে শিক্ষার আলো দিয়েছেন এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, মারিয়া কন্সিসাও প্রথম পর্তুগিজ নারী হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্কুল-মাদ্রাসায় সাংস্কৃতিক কর্মকা- বিস্তৃত করার সুপারিশ

জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ রুখতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল এবং মাদ্রাসায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করার সুপারিশ করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ২ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির বৈঠকে তৃণমূল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তার করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন (রিমি)। বৈঠকে বলা হয়, জ্ঞানভিত্তিক ও মানবিক বোধসম্পন্ন দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে শিশুদের সৃজনশীল চর্চার আরো সুযোগ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ

দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির চূড়ান্ত নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৬ নভেম্বর শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন এতে স্বাক্ষর করেন। নীতিমালা অনুযায়ী এবারো দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। শুধু উপজেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে তা ম্যানুয়ালি করা যাবে।

বিদ্যালয় থাকবে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বিদ্যালয় থাকছে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। এই বিষয়টি সংশোধন করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৬'- এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। ৭ নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুমোদন দেন।

বেসরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় কোটা সংরক্ষণের নীতিমালা জারি

ঢাকা মহানগরীতে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তিতে ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা সংরক্ষণের বিধান রেখে নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৮ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে 'বেসরকারি স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা' শিরোনামে এই নীতিমালা জারি করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যা না পাওয়া গেলে তাদের নাতি-নাতনিদের জন্য শূন্য আসনের ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ২ শতাংশ, লিল্লাহ বোর্ডিং-এ অবস্থানরত শিশুর জন্য থাকবে ১ শতাংশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় শূন্য আসনের ২ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিস্টিক শিশুদের জন্য করণীয়

অটিজম শব্দটির সাথে আমাদের দেশের অধিকাংশ মা-বাবাই জ্ঞাত না। অটিজম একটি মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যা হলেও রোগটি চিহ্নিত করা হয় শিশুদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ, যোগাযোগের দক্ষতা এবং বিকাশের ধারা থেকে।

এই রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। এই রোগের সাথে মানসিক প্রতিবন্ধকতা, জেদি ও আক্রমণাত্মক আচরণ, অহেতুক ভয় কিংবা খিচুঁনি ইত্যাদি থাকতে পারে। অটিজমের কোনো জাদুকরী চিকিৎসা নেই। যত দ্রুত এই রোগটি শনাক্ত করা যায় এবং অটিস্টিক শিশুটিকে সঠিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায় তত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করা সম্ভব।

অটিজম বাচ্চাদের মানসিক কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন– ভাষাগত সমস্যা, চোখে চোখে তাকায় না, সামাজিক কোনো যোগাযোগ থাকে না। পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগ থাকে না, অন্যান্য মানুষের প্রতি মনোযোগ কম। অনেক শিশু একা একা থাকতে এবং নিজের মনে বিড়বিড় করতে পছন্দ করে। কোনো খেলনার প্রতি আকর্ষণ থাকে না বরং বিভিন্ন ছোটোখাটো জিনিস, যেমন: কলমের মুখ, ফিতা, ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে। আবার কিছু কিছু অটিস্টিক শিশুর বাবা বা মা যে-কোনো একজনের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে। বিভিন্ন সময়ে এই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করে থাকে ইত্যাদি।

অটিস্টিক শিশুদের জন্য বাসায় করণীয় কিছু কর্মসূচি

অটিজম শিশুদের স্পেশালভাবে তাদের দৈনন্দিন পরিচর্যা করতে হবে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে রাত অবধি ওদের দৈনন্দিন কাজের একটা চার্ট করে নিতে হবে। কারণ প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু কাজ থাকে। এদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সারাদিন ওরা অস্থিরতা করতে করতে দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। তাই ওদেরও কিছু অর্থপূর্ণ কাজ দিতে হবে।

ঘুম থেকে উঠার জন্য আপনার শিশুর খাটের পাশে বেল সিস্টেম ঘড়ি রাখুন। যা শুনে সে বুঝতে পারে এখন ঘুম থেকে উঠার সময়। তারপর বাথরুমে নিবেন এবং মুখে বলবেন বলো আমরা 'সি' দিব। দাঁত মাজব। আমরা বিশেষ করে মাকে বলি, দৈনদিন কাজগুলো আপনার শিশুকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করবেন। কীভাবে কাপড় পরবে বা নাস্তা খাবে। এভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কোনটা পচা বা লজ্জা সেটা আপনাকে শিখাতে হবে এবং বলতে হবে মুখের ভাবভঙ্গির মাধ্যমে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ সেটা হলো ওর সাথে মা-বাবাকে তার মতো অভিনয় করতে হবে। যেমন : পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এক সাথে গোল করে বসবেন, শিশুকে মাঝখানে রেখে বল ছুড়ে মারবেন। এভাবে ওর মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে , এই অটিস্টিক শিশুরা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে।

১. আত্মকেন্দ্রিক : এই স্তরের শিশু নিজেদের মধ্যে থাকে, একা খেলতে পছন্দ করে। অন্যের সাথে যোগাযোগ করার কোনো আগ্রহ তাদের থাকে না। উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে কোনো তথ্য দিতে এবং গ্রহণ করতে পারে না। এরা কোনো নির্দেশ মানে না। এই সব শিশুরা মুখে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করে এবং এদের মধ্যে হাত ও পায়ের চলনের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

২. অনুরোধের স্তর : এই স্তরের শিশু খুব অল্প সময়ের জন্য বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ করে। শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে।

৩. যোগাযোগের স্তর : এই স্তরের শিশু পারিবারিক পরিবেশে পরিচিত মানুষের সাথে শুধু যোগাযোগ স্থাপন করে। পারিবারিক শব্দ এবং সাধারণ কিছু প্রশ্ন বুঝতে পারে। এই শিশুরা তাদের চাহিদা আঙুল দিয়ে দেখাতে সক্ষম হয় এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিনতে পারে।

৪. সহযোগী স্তর : এই স্তরের শিশু সমবয়সিদের সাথে অল্প অল্প খেলে। বিভিন্ন কারণে যোগাযোগ করতে পারে, যেমন: অনুরোধ-অনুমতি, প্রশ্ন-উত্তর, তথ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ। অনেক শব্দ সে বুঝতে পারে। এসব শিশুরা অল্প ভাষার আদান-প্রদান করতে পারে।

এই ৪টি পর্যায়ের যে-কোনো একটিতে হয়ত আপনার শিশুটি অবশ্যই থাকবে। অটিস্টিক শিশু নিজের মতো থাকতে পছন্দ করে। কারো সাথে মিশতে চায় না ।

কিছু অটিস্টিক শিশু আছে নিজের হাত দিয়ে বাবা-মায়ের হাত ধরতে চেষ্টা করে স্বল্প যোগাযোগ করতে পছন্দ করে। আবার কোনো শিশু পার্টনারশিপ পছন্দ করে। অর্থাৎ ওর সাথে কেউ খেলায় অংশগ্রহণ করে সেটা সে চায়। এবং পরক্ষণে বাচ্চাকে ধাক্কা দিতে সে আনন্দ অনুভব করে।

কথা বলার জন্য কিছু করণীয়

শিশুদের সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। শিশুকে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখান। শিশুকে আপনার চোখের দিকে তাকাতে ও ঠোঁটের নড়াচাড়া অনুসরণ করতে সাহায্য করুন। ছবির বই, জিনিসপত্র ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে কথা শেখান। শিশুকে অক্ষর ও ছড়া গানের অডিও ক্যাসেট শোনাতে পারেন। শেখানো কথাগুলো প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করুন ও তার সাথে নতুন শব্দ শেখানোর চেষ্টা করুন।

সামাজিক বিকাশ

শিশুকে সবরকম সামাজিক পরিবেশে নিয়ে যান। আত্মীয়স্বজনদের বাসায়, জন্মদিনে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, শিশু পার্কে এবং শপিং করতে। এই রূপ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শিশুকে সাহায্য করুন। বাড়ির পরিবেশে কীভাবে খাপ খাবে এবং সময়ের সাথে প্রতিটি কাজে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করুন। সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে এবং ভাবের আদান-প্রদান করতে শেখান।

সামাজিক কিছু আদান-প্রদান করা শেখান। যেমন: হাসির সাথে হাসতে পারা, আনন্দ প্রকাশ করতে পারা, সালম দেওয়া, চোখে চোখে তাকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা, শরীরের সাথে স্পর্শ করে বন্ধুত্ব করা ইত্যাদি।

শিশুকে ওর বয়সের বুদ্ধি ও মান অনুযায়ী ব্যক্তিগত দক্ষতাগুলো শেখান, যেমন: যথাস্থানে প্রসাব-পায়খানা করা, নিজ হাতে খাওয়া, দাঁত মাজা, গোসল করা, জামা-জুতো পড়া, পেনসিল-কলম দিয়ে আঁকি-ঝুকি করা এবং দরকারি জিনিসগুলো ব্যবহার করা। শিশুর নিজস্ব কোনো প্রতিভা থাকলে অর্থাৎ গান শেখা, ছবি আকঁতে বা তার পছন্দের কোনো কাজকে সমর্থন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ। শিশুর কাজটি করতে বা শিখতে পারলে তাকে পুরস্কার দিন। শিশুর আচরণ অনুযায়ী একটি স্কুলে দিন ও ঘরের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

অটিস্টিক শিশুদের খাবারের তালিকা

অটিস্টিক শিশুদের খাদ্যাভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুদের বাইরের ফাস্টফুড এড়িয়ে চলতে হবে। ইস্টযুক্ত খাবার দেওয়া যাবে না। সামুদ্রিক মাছ, টিন জাতীয় খাবার, জুস এড়িয়ে চলতে হবে। যতটুকু সম্ভব ঘরের তৈরি খাবার খাওয়াতে হবে।

১-৫ বছর শিশুদের বেড়ে উঠার বয়স। এ সময়ে ওরা ওদের মতো কাজ করতে পছন্দ করে । সুতরাং আপনার শিশুটি স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠছে কি-না সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের মা-বাবার। আমাকেই আমার শিশুর মনের গভীরে যেতে হবে এবং সে কী চায় তা জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। সেভাবেই আমাদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবেদন : আফরোজা আক্তার

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ

মহিলা কোটা যথাযথভাবে অনুসৃত হওয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পদে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক। সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পদে কর্মরতদের মধ্যে ৫ জন নারী কর্মকর্তা সচিব, ৫৪ জন অতিরিক্ত সচিব, ১০৩ জন সরকারের যুগ্ম সচিব রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান যদি আমরা লক্ষ করি দেখব– কেবলমাত্র সচিবালয়ে বিভিন্ন অর্থবছরে কর্মরত পুরুষ ও মহিলাদের হার। উল্লেখ্য, ১৫-১৬ অর্থবছরে পুরুষ কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮২ জন, মহিলা কর্মকর্তা ছিল ১৮ জন। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। শতকরা ৭০ জন গ্রামে বাস করে। গ্রাম ও শহরে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও অংশীদারিত্ব উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, অতএব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার নারীদের শিক্ষা, উন্নয়ন ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি, ব্যবসাসহ সব ক্ষেত্রেই নানাবিধ সহায়তা দিয়ে আসছে। সরকার নারীদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে সাথে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সম্ভাব্য উদ্যোগ যেমন–

নীতি ও আইনি কাঠামো তৈরি করা, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা, নারীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বৈষম্য দূর করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোতে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ, নৃগোষ্ঠীয় নারীদের সমস্যাগুলো সমাধান এবং নারীর ভাবমূর্তি বাড়ানো হচ্ছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় উক্ত নীতিকৌশল বাস্তবায়নে প্রায় প্রতিটি বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। নারী উন্নয়নে সরকার সংবিধানের দায়বদ্ধতা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার আলোকে প্রণীত ২০২১ সালের নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কয়েকটি লক্ষ্য স্থির করেছে। যেমন– বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করা। **প্রতিবেদন : সুফিয়া বেগম**

দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হবে : প্রধানমন্ত্রী

জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে দেশের সব বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৬ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর কৃষিবিদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের (বিসিপিএস) ত্রয়োদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এ কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য ১৫ বছর মেয়াদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কাজ করছে। চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত উল্লেখ করে চিকিৎসকদের আরো আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা খাতে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ইতোমধ্যে জনগণ ভোগ করছে। জনগণ বিনা পয়সায় সেবা ও ওষুধ পাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার জনগণের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২ হাজার ৭২৮ জন সরকারি সার্জন ও ১০৮ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দিয়েছে। আরো নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের সব জায়গায় রোগীর সংখ্যা অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আর শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়ে ছয় মাস করা হয়েছে। এছাড়া দেশকে পোলিও মুক্ত ও

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে ২৬ অক্টোবর ২০১৬ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস)-এর ১৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয় –পিআইডি

টিটেনাস মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ খাতের উন্নয়নে সরকারের নানা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে 'শেখ হাসিনা হেলথ কেয়ার'

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, সরকার এখন গরিব জনগণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। 'শেখ হাসিনা হেলথ কেয়ার' নামের এ কর্মসূচি সারা দেশে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

৭ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি কিমিয়াও ফ্যান সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী তাকে এসব বলেন। মন্ত্রী বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার সাফল্যের পর সরকার এখন গরিব জনগণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকার গরিব মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 'শেখ হাসিনা হেলথ কেয়ার' নামের এই কর্মসূচি সারা দেশে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করতে সরকার পর্যায়ক্রমে কাজ করছে : নাসিম

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করতে সরকার পর্যায়ক্রমে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ২৭ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট অব ডিজিজ অ্যান্ড ইউরোলোজিতে এক কর্মশালার উদ্‌বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে এ লক্ষ্যেই আধুনিক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২৭ অক্টোবর ২০১৬ শেরেবাংলা নগরে কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে 'ইউরোগাইনো রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং' শীর্ষক কর্মশালা ও সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এমনকি ঢাকা শহরে বিশেষায়িত হাসপাতাল হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ও থানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য স্থাপনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে চিকিৎসা সেবাকে মানবতার

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সেবা মনে করে তার চিন্তা-চেতনা দিয়ে চিকিৎসকদের সহায়তা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। **প্রতিবেদন : আমজাদ হোসেন**

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার দুর্লভ চিত্রের প্রদর্শনী

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে 'সংগ্রামী জীবনগাথা' শীর্ষক শিরোনামে এক আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে কারা অধিদপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে 'সংগ্রামী জীবনগাথা' শীর্ষক শিরোনামে এক আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন শেষে পরিদর্শন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত

জার্নি। এই প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার দুর্লভ আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে পুরাতন কারাগারের ভেতরে এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চারনেতার কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং বিভিন্ন কারাকক্ষ ঘুরে দেখারও সুযোগ ছিল।

গঙ্গা–যমুনা নাট্যোৎসব

হঠাৎ 'টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল'–গানের সঙ্গে ঢোল হাতে মিলনায়তনের বিভিন্ন দিক থেকে নৃত্যশিল্পীরা এলেন মিলনায়তনে। সমবেত উদ্‌বোধন, নৃত্য ও সবার বক্তব্যের পর একটি গরুর গাড়ির অনুকৃতি এল মঞ্চে। অতিথিরা সেখানে প্রদীপ জ্বালালেন। এরকম ব্যতিক্রমী ছিল গঙ্গা-যমুনা নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্‌বোধন।

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে ১১ অক্টোবর এ উৎসবের উদ্‌বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এবারের উৎসবটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

কবি শামসুর রাহমানের জন্মদিন উদ্‌যাপন

কবি শামসুর রাহমানের ৮৮তম জন্মদিন ছিল ২৩ অক্টোবর। এদিন বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র চত্বরে এ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে জাতীয় কবিতা পরিষদ ও শামসুর রাহমান স্মৃতি পরিষদ। কবির কবিতা পড়া, গান ছাড়াও ছিল কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা। এ অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বাংলা একাডেমি ও শামসুর রাহমান স্মৃতি পরিষদের সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। আলোচনা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, কবি রবিউল হুসাইনসহ অনেকে।

নজরুল মেলা-২০১৬

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দর্শন ও চেতনা সমুন্নত রাখার প্রয়াসে বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যপী নজরুল মেলা। নজরুল সংগীত শিল্পী পরিষদ ২৭ অক্টোবর এ মেলার আয়োজন করে। এ মেলার উদ্‌বোধন করেন শিল্পী ফেরদৌসী রহমান, কবি নাতনি খিলখিল কাজী, অনিন্দিতা কাজী ও ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী সেলিম আর এফ হোসেন। সম্মেলনে দেশব্যাপী নজরুল চর্চা বেগবান করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এতে প্রতি জেলায় দুজন করে প্রতিনিধি অংশ নেয়।

শিল্পী শাহজাহানের পুরস্কার লাভ

বাংলাদেশের শিল্পী অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদ জাপানের মনবু-কাগাকু-দাই জিনশো পুরস্কার পেয়েছেন। জাপান সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১ অক্টোবর এ পুরস্কার দিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ আসরটি বসেছিল জাপানের টোকিওর মেট্রোপলিটন আর্ট মিউজিয়ামে। অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদের শিল্পকর্মের শিরোনাম 'ব্লুম টাইম অব হান্ড্রেড ইয়ার'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট। জাপানি ও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বন্ধুত্বের শত বছর পূর্তির নিদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই ছিল এ আয়োজন।

কুষ্টিয়ায় লালন মেলা

ফকির লালন শাহের সৃষ্টিকর্ম ও তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা ও দেশের সুপ্ত প্রায় সাংস্কৃতিক বোধকে প্রাণবন্ত করার উদ্দেশে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় দুই দিনের লালন মেলার আয়োজন করে। মেলার ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন। জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও লালন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

একাডেমি। লালন সমাধি প্রাঙ্গণে ১০ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনের এ লালন উৎসব। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্‌বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

১৯ অক্টোবর ২০১৬ দেশের সবচেয়ে বড়ো তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের পর্দা উঠলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা ১২টায় ফিতা কেটে এ মেলার উদ্‌বোধন করেন। তৃতীয় বারের মতো এ মেলা এবার শুরু হয় রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এছাড়া

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ অক্টোবর ২০১৬ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় 'Digital World 2016' কনফারেন্সের উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির পরিচালক কবীর বিন আনোয়ার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার ও আরো অনেকে।

তিন দিনের এই মেলায় চলে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা। দেশি-বিদেশি বক্তারা তাদের উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও সফলতার গল্প শোনান এ আয়োজনে। এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আইটি ক্যারিয়ার বিষয়ক সম্মেলনের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ডেভেলপার সম্মেলন। এছাড়া ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের তরুণ শিক্ষার্থী ও প্রযুক্তি প্রেমিদের জন্য প্রদর্শনীতে সফ্‌টওয়্যার শোকেসিং, ই-কমার্স এক্সপো, স্টার্টআপ জোন ছাড়াও আইসিটি সংশ্লিষ্ট ১২টি সেমিনার, ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস কনফারেন্স ও আইসিটি এডুকেশন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সমাপনী অনুষ্ঠান 'অ্যাওয়ার্ড নাইট' অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, আইসিটি ও প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ অন্যান্যরা।

আরো দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা পাবে দেশের মানুষ

দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে ১ হাজার ৫শ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ সুবিধাসহ নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট নিয়ে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে গোটা দেশ। কক্সবাজারে প্রথম স্থাপিত সাবমেরিন স্টেশনের চেয়ে আটগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত পটুয়াখালীর কুয়াকাটার নির্মাণাধীন এই সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনটি। এটি চালু হলে বরিশাল বিভাগসহ সারা দেশের মানুষ দ্রুতগতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পাবেন। এ প্রকল্পটি চালু হলে এর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্কের কারণে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ব্যান্ডউইথ রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রথম প্রকল্পটির 'লাইফ টাইম' শেষে দ্বিতীয় প্রকল্প থেকে এ সেবা পাওয়া যাবে। পটুয়াখালীর কুয়াকাটার মাইটভাঙ্গা এলাকায় প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করে অতি শীঘ্রই স্টেশনটি চালু করা হবে।

ই-কমার্সের আওতায় আসছে পোস্ট অফিস

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম জানান, দেশের ৯ হাজার ৮৮৬টি পোস্ট অফিসকে ই-কমার্সের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে। এই লক্ষ্যে পোস্ট অফিসগুলোকে শিগ্‌গিরই ই-কমার্সের সঙ্গে যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

২৬ অক্টোবর রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) আয়োজিত ই-কমার্স পলিসি কনফারেন্সের তৃতীয় সেশনে 'বিজনেস লিডারশিপ ডায়ালগ অন ই-কমার্স' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ই-কমার্সের ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো। প্রাথমিকভাবে এ কাজ সরকার করে দিয়েছে। এছাড়া এ খাতে লেনদেন নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খরচ কমাতে দেশের ৯ হাজার ৮৮৬টি পোস্ট অফিসকে ই-কমার্সের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

ডিজিটাল মার্কেটিং সামিট সম্মেলন

দেশে তৃতীয়বারের মতো 'ডিজিটাল মার্কেটিং সামিট' নামক বিপণন বিষয়ক দিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম (বিবিএফ)। হুয়াওয়ে, এসএসডি টেক এবং দ্য ডেইলি স্টারের সহযোগিতায় ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পাঁচটি কিনেট সেশন বা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন, দুটি কেস স্টাডি উপস্থাপন, একটি প্যানেল আলোচনা এবং চারটি নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক মতবিনিময় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'ডিমিস্টিফাইং ডিজিটাল মার্কেটিং' বা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের রহস্য উন্মোচন। এই সম্মেলনে ডিজিটাল মার্কেটিং জগতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পেশাজীবি, নীতি নির্ধারক ও শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদরা একই ছাদের নিচে সমবেত হয়ে পারস্পরিক মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ডিজিটাল মার্কেটিং জগতের পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মেলনে চারটি নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক মতবিনিময় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়।

গুগল, আলিবাবা, এসএসডি টেক এবং ওয়েবকেবলসহ ডিজিটাল মার্কেটিং জগতের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা এসব নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক মতবিনিময় অধিবেশন পরিচালনা করেন। 'ডিজিটাল মার্কেটিং সামিট-২০১৬' পরিবেশিত হয়েছে হুয়াওয়ে এবং এসএসডি টেকের সৌজন্যে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

অনুমোদন পেল বারি আলুর নতুন জাত

তাপ ও লবণাক্ততা– দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আলু উৎপাদনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। যার ফলে বিস্তার লাভ করতে পারছে না এই অঞ্চলের আলু চাষ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আলু চাষিদের জন্য সুখবরের বার্তা নিয়ে এসেছে বারি আলু ৭২ ও ৭৩। তাপ ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু এই দুটি আলুর জাত উদ্ভাবনে সফলতা পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। এবারই প্রথম তাপ ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু এই দুই জাতের আলু উদ্ভাবনে সফলতা মিলেছে।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিমল চন্দ্র কুণ্ডুর নেতৃত্বে দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে ল্যাব ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা চালিয়ে এ সফলতা মিলেছে। এতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আলু চাষে বিপ্লব ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গত ৯ অক্টোবর চূড়ান্তভাবে জাত দুটি অনুমোদন পায়।

নতুন উদ্ভাবিত দুটি জাতের জার্মপ্লাজম নেওয়া হয়েছে সিআইপি থেকে। ২০১১-১২ সালে ১০টি তাপ সহনশীল ও ১৫টি লবণাক্ত সহিষ্ণু সিআইপি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। তাপ সহিষ্ণু ১০টি জার্মপ্লাজমের মধ্যে দুটির ফল ভালো পাওয়া যায়, যা সিআইপি ১২৭ ও ১৩৯। আর লবণাক্ত সহিষ্ণু যে ১৫টি জার্মপ্লাজম নিয়ে কাজ শুরু হয় তারমধ্যে দুটি সিআইপি ১০২ ও ১৩৯-এ সফলতা মিলেছে। সিআইপি ১৩৯ উভয় গবেষণায় সফলতা পাওয়ায় তাপ ও লবণাক্ত সহিষ্ণু হিসেবে এবং সিআইপি ১২৭ তাপ সহিষ্ণু হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে। আর সিআইপি ১০২ সেভাবে সফল হয়নি।

এই তিনটির ভালো ফল প্রমাণিত হওয়ায় কন্দাল ফসল গবেষণাকেন্দ্র মূল্যায়ন ও অবমুক্তির জন্য প্রস্তাব করে। এরপর আঞ্চলিক কারিগরি কমিটি দ্বারা মূল্যায়িত হয় এবং জাতীয় কারিগরি কমিটি সুপারিশ করে। শেষ ধাপে গত ৯ অক্টোবর জাতীয় বীজ বোর্ডে এই দুটি জাত চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল।

নতুন জাতের ধান ব্রি ৭৮

ব্রি ধান ৭৮ নামে নতুন একটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রির বিজ্ঞনীরা। জাতটিতে একই সঙ্গে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জিন সন্নিবেশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে STRASA-BMZ প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে ওই কৌলিক সারিটির এফ৬ জেনারেশনে ব্রিতে আনা হয়। উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী জাতটি চারা অবস্থায় ৬-৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

ব্রি ধান ৭৮-এর রয়েছে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য। এ জাতে আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এর কুশিগুলো গাছের গোড়ার দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত থাকে। চারাগুলো বেশ লম্বা হয়ে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ১২০ সে.মি. যা রোপা আমন মৌসুমে উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী। জীবনকাল ১৩৩-১৩৬ দিন। ধানের রং সোনালি ও আকৃতি চিকন এবং মাঝারি লম্বা। চাল মাঝারি লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে সাদা রঙের। এর জীবনকাল ব্রি ধান ৪১-এর চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম। রোপা আমন মৌসুমে উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে ব্রি ধান ৪১-এর চেয়ে ভালোভাবে টিকে থাকে এবং বেশি ফলন দিয়ে থাকে। রোপা আমন মৌসুমে উপকূলীয় জোয়ার-ভাটায় ৮-৯ দিন নিমজ্জিত থেকেও বেশি ফলন দেয়। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুরা নিজস্ব ভাষার বই পাচ্ছে

প্রথমবারের মতো নিজস্ব মাতৃভাষায় বিনামূল্যে বই পাচ্ছে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫০ হাজার শিশু। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্ধলক্ষাধিক শিশুকে মাতৃভাষায় পাঠদান করানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সব এলাকায় পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত শিক্ষকও নেই। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক থাকলেও অনেকের উচ্চারণ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা সংকট দূর করতে যেসব স্কুলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা ভর্তি হবে সেখানে ওই নৃগোষ্ঠীর শিক্ষক না থাকলে অন্যত্র থেকে বদলি করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে। তারপরও শিক্ষক সংকট থাকলে জরুরি ভিত্তিতে স্ব-স্ব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

এনসিটিবি'র সূত্রে জানা গেছে, প্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের আদলে রচনা হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষার বই। শিশুদের আনন্দের

সঙ্গে পাঠদানের জন্য বইয়ে ৮টি বিষয় যুক্তের সঙ্গে স্ব স্ব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে ছড়া, কবিতা, গল্প লেখা হয়েছে। বইয়ে ছবির মাধ্যমে বর্ণমালা শেখানো, গণনা শেখার ধারণা, সাধারণ জ্ঞান (চিহ্নের মাধ্যমে হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চেনানো), পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি যুক্ত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্ব-স্ব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় রচিত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক প্যানেল পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়গুলো নির্ধারণ করেছেন। ১০টি গল্পের মধ্যে চারটি থেকে ছয়টি নৃগোষ্ঠীর নিজেদের ভাষায় রচিত। বাকিগুলো আমার বই থেকে অনুবাদ করা। শিক্ষকদের পাঠদানের নির্দেশিকাও তৈরি করা হয়েছে। দেশে সরকারি হিসাবে ৩৭টি এবং বেসরকারি হিসাবে ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। প্রায় সব নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না থাকায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিবার থেকে মাতৃভাষায় কথা বলা শিখলেও নিজেদের বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা পেত না তারা। অনেক সময় মাতৃভাষা উচ্চারণও বিকৃত হয়ে যায়। তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ চলছে। পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে এনসিটিবিকে সহযোগিতা করছে প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর পাঁচজন করে মোট ৩০ জন। প্রতিটি গ্রুপকে তদারকি করছেন এনসিটিবি'র পাঁচজন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ। এনসিটিবি সূত্র জানায়, আগামী শিক্ষাবর্ষে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিকে ৫১ হাজার ৭৮২টি বই ছাপানো হবে। আগামী জানুয়ারিতে বিনামূল্যের এসব বই সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জের বাহুবল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কুলাউড়া, রংপুরের পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, জামালপুরের বকশিগঞ্জ, শেরপুরের শ্রীবদী, নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলাসহ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে অপর নৃগোষ্ঠীর শিশুদেরও মাতৃভাষায় বই দেওয়া হবে। খসড়া শিক্ষা আইনে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পর্যায়ক্রমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর (অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত চালুর কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় ধরলা সেতু

প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে দ্বিতীয় ধরলা সেতু। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার কুলঘাট সংলগ্ন লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্ত রেখায় ধরলা নদীর উপর এই সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। এই সড়ক সেতু নির্মিত হলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে নতুন দিগন্ত সূচিত হবে। বঙ্গ সোনাহাট শুল্ক স্থলবন্দরের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সহজ হবে। এরফলে প্রায় চারশত কিলোমিটার দূরত্ব কমবে এবং সময়ও কম লাগবে এবং এতে পরিবহণ ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটির প্রায় ৪০ ভাগ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। জুলাই ২০১৭-এর মধ্যে বাকি ৬০ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নদীর উপর একটি সড়ক সেতু নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীবাসীদের। ৯৫০ মিটার দীর্ঘ পি সি গার্ডার সেতু নির্মাণ কাজের জন্য বর্তমান সরকার বরাদ্দ প্রদান করেছে প্রায় ১৯২ কোটি টাকা। জানা গেছে, ইতোমধ্যে ২৪০টি পাইলের মধ্যে ১১২টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাবাটমেন্ট ও পিয়ারের পাইল ক্যাপ মোট ২০টির মধ্যে ৮টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি বেজে পিয়ার কলামের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটির লালমনিরহাট প্রান্তের অ্যাবাটমেন্ট ওয়ালের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া নদী শাসনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আরসিসি ব্লক তৈরি চলছে। সেতুর দুই প্রান্তের সংযোগ সড়কের মটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে।

সেতুটি চালু হলে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, ভুরঙ্গামারী ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার প্রায় দশ লাখ মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন, সেতুটি চালু হলে ভুরঙ্গামারীর বঙ্গ সোনাহাট স্থলবন্দর থেকে ঢাকার দূরত্ব কমে আসবে প্রায় ৩০ কি.মি.। অন্যদিকে সেভেন সিস্টারস নামে খ্যাত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৭টি রাজ্য আসাম, মেঘালয় মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও অরুনাচল রাজ্যর সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সূচিত হবে নতুন মাত্রা। এরফলে বঙ্গ সেরোনাহাট শুল্ক স্থলবন্দর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। রংপুর অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন নতুন খাত সৃষ্টি আর উন্নত হবে মানুষের জীবনযাত্রার মান। রংপুর হবে ভারতের সেভেন সিস্টারের সেতুবন্ধ। **প্রতিবেদন : শিবপদ ম-ল**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কান্তজীর মন্দির

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ২০ কি.মি. উত্তরে এবং কাহারোল উপজেলা সদর থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে ঢেপা নদীর তীরে অবস্থিত এটি। দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পশ্চিমে সুন্দরপুর

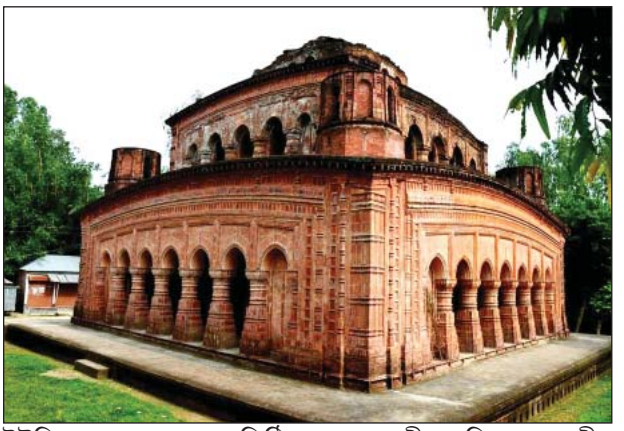

ইউনিয়নের কান্তনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় কান্তজীর মন্দির। কান্তজীর মন্দিরটিতে লক্ষ করা যায় টেরাকোটা অলংকরণের বৈচিত্র্য, ইন্দো-পারস্য ভাস্কর্যের কৌশল আর অপরূপ শৈল্পিক কারুকার্য, যা বিস্ময় জাগরিত করে।

কালিয়াকান্ত জিউ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ অধিষ্ঠানের জন্য এ মন্দির নির্মিত। এজন্য মন্দিরটি কান্তজীর মন্দির নামে পরিচিত। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির সম্পর্কে পৌরাণিক বহু গল্প ও উপাখ্যান প্রচলিত রয়েছে। যে স্থানে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে সেটি একটি প্রাচীন স্থান এবং প্রাচীন নগরীরই একটি অংশ। প্রাচীন দেয়াল ঘেরা দুর্গই তার সাক্ষ্য বহন করে। কথিত আছে, মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার গোশালা ছিল এখানে।

প্রায় ১ মিটার উঁচু এবং প্রায় ১৮ মিটার বাহু বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত একটি বর্গাকার বেদীর ওপর এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। বেদীর পাথরগুলো আনা হয়েছিল প্রাচীন বানগড় (কোটিবর্ষদেব কোট) নগরের ভেঙে যাওয়া প্রাচীন মন্দিরগুলো থেকে।

বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬ মিটার। মন্দিরের চারদিকে আছে বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার সামনে আছে ২টি করে স্তম্ভ। স্তম্ভগুলো বিরাট আকারের এবং ইটের তৈরি। স্তম্ভ ও পাশের দেয়ালের সাহায্যে প্রত্যেক দিকে ৩টি করে বিরাট খোলা দরজা তৈরি করা হয়েছে। বারান্দার পাশেই রয়েছে মন্দিরের কক্ষগুলো। একটি প্রধান কক্ষের চারদিকে আছে বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো কক্ষ। তিনতলা বিশিষ্ট এ মন্দিরের নয়টি চূঁড়া বা রত্ন ছিল। এজন্য এটিকে নবরত্ন মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলো ভেঙে যায়। মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফুট।

মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায়, দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ প্রাণনাথ রায় (মৃত্যু ১৭২২ খ্রি.) তার শেষ জীবনে মন্দির তৈরির জন্য কাজ শুরু করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার আদেশ অনুসারে দত্তকপুত্র মহারাজা রামনাথ রায় এই মন্দির তৈরির কাজ শেষ করেন ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে। ইট দ্বারা তৈরি এই মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির চিত্র ফলকের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের প্রায় সবকটি প্রধান কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে শ্রী কৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন কাহিনি এবং সম্রাট আকবরের কিছু চিত্রকর্ম।

কান্তজী বা শ্রী কৃষ্ণের বিগ্রহ নয় মাস এ মন্দিরে অবস্থান করে এবং রাস পূর্ণিমায় (এক পক্ষকালের জন্য) তীর্থ মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পুণ্যার্থী আগমন করেন এই মেলায়। বহু দর্শনার্থী ও পর্যটক আসেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চিত্র ফলকের অলংকরণে সুসজ্জিত এই মন্দিরটি দেখার জন্য।

প্রতিবেদন : অনিন্দিতা

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে– স্পিকার

'২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২২) : প্যারিস চুক্তি ২০১৫ এবং বাংলাদেশের প্রত্যাশা' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ও কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সিপিএ চেয়ারপারসন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের (এপিপিজি) উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনায় স্পিকার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সারাবিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। সর্বত্র এখন এটা নিয়ে আলোচনা চলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের জন্য এটাও একটা বড়ো অর্জন। যে কার্বন নির্গমনের জন্য আমরা দায়ী নই, অথচ আমাদের এর ক্ষতি বইতে হচ্ছে, এটাও

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ২ নভেম্বর ২০১৬ সিরডাপ মিলনায়তনে '২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২২), প্যারিস চুক্তি ২০১৫ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা' শীর্ষক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

মানবাধিকার লঙ্ঘন। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হিসেবে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি, ইতোমধ্যে এটাও আমাদের একটা অর্জন। যেটি প্যারিস চুক্তিতেও স্থান পেয়েছে। আসুন এটাকে নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাই। ইস্যুটিতে ইতোমধ্যে বৈশ্বিক ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। যার কারণে বিশ্ব নেতৃত্ব স্ব-উদ্যোগী ভূমিকায় কাজ করছেন। তিনি আরো বলেন– জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এগোতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা গঠনমূলকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। কপ-২১ -এর চুক্তি হওয়ার পর এই মাসেই কপ-২২ হতে যাচ্ছে। চুক্তি করতে পারাও কম কথা নয়। এভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে যতটুকুই অর্জন করছি সবই মাইলফলক। এছাড়া এ বিষয়ে মত বিনিময় করেন বিভিন্ন পরিবেশবিদ এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা। সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ। এপিপিজি'র সেক্রেটারি জেনারেল শিশির শীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক শরমিন্দ নিলোর্মি।

ক্ষতিকর বায়ুদূষণের শিকার ৩০ কোটি শিশু

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০ কোটি শিশু ঘরের বাইরে উচ্চমাত্রায় দূষিত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। এতে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধাসহ নানা শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এই বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতি সাতজন শিশুর মধ্যে একজন যে বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাচ্ছে, সেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে অন্তত ছয় গুণ বেশি দূষিত। বায়ুদূষণ বর্তমানে শিশুমৃত্যুর একটি বড়ো কারণ। শিশু অধিকার আদায় ও কল্যাণে কাজ করা জাতিসংঘের এই সংস্থা বায়ুদূষণ কমাতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

কবি সৈয়দ শামসুল হককে উৎসর্গ করে

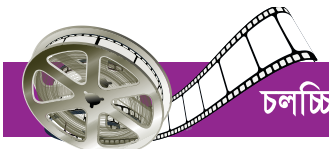

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

চলচ্চিত্র উৎসব

তরুণ নির্মাতাদের তৈরি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬'। এবারের উৎসবটি উৎসর্গ করা হয়েছে সদ্যপ্রয়াত কবি সৈয়দ শামসুল হককে। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রদর্শিত হয় ৮৪টি চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত এই উৎসবে সহযোগিতা করেছে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম ও বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রকলা মিলনায়তনে ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। উদ্‌বোধনী সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় জহির রায়হান পরিচালিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *স্টপ জেনোসাইড*। এছাড়া মোরশেদুল ইসলামের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *আগামী*, তারেক মাসুদের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *আদম সুরত*, আমিনুর রহমান মুকুলের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *অবরোধ*, রহমান লেনিনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *মনফড়িং* এবং ইয়াসমিন কবিরের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *পরবাসী মন আমার* প্রদর্শিত হয়। ৮ অক্টোবর উৎসবের সমাপনী দিন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ও বিশেষ জুরি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয় ।

এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩ অক্টোবর বেলা ১১টায় উৎসবের উদ্‌বোধনীতে প্রবীণ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সাবেক সংসদ সদস্য ও অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এমসিজে ফিল্ম ক্লাব প্রকাশিত স্যুভেনির *এশীয় চলচ্চিত্র পাঠ*- এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উৎসব চলে বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত।

সিয়াটল সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ১১তম আসর

সিয়াটল সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ১১তম আসরে বিশেষ ফোকাসে রয়েছে বাংলাদেশের ছবি। সিয়াটলের বিভিন্ন স্থানে ১৫ অক্টোবর শুরু হওয়া এ আয়োজন চলে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত। 'ভালোবাসা জয়ী' ভাবনা নিয়ে সাজানো উৎসবটিতে ২৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র ও ২২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি স্থান পায়। এরমধ্যে উদ্‌বোধনী ছবি ছিল অমিতাভ রেজা চৌধুরী পরিচালিত *আয়নাবাজি*।

এছাড়া বাংলাদেশ থেকে মনোনীত হয়েছে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *পিঁপড়াবিদ্যা*। এ উৎসবে আরো আছে– আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার চলচ্চিত্র। এগুলো প্রদর্শিত হয়েছে সিয়াটল এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম, স্ট্রাউম জুইশ কমিউনিটি সেন্টার, এসআইএফএফ ফিল্ম সেন্টার, সার্কো থিয়েটার, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন'স থম্পসন হলে।

প্রতিবেদন : মিতা খান

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যমান রাজনৈতিক টানাপোড়ন। নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকির বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পিছিয়ে রয়েছে। অথচ এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। একে অন্যের সম্পদ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে পারে খুব সহজে।

ঢাকার একটি হোটেলে দুদিনব্যাপী এ সম্মেলন ১৬ অক্টোবর শেষ হয়। সম্মেলনের আয়োজক সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। সম্মেলনের শেষ দিন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ, সিপিডি চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান সরকারের কর্মকর্তা ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ অক্টোবর ২০১৬ মরক্কোর মারাক্কাশে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনফারেন্সের High Level Segment of COP 22 -এর উদ্‌বোধন পর্বে ভেন্যুর প্লেনারি হলে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান –পিআইডি

গবেষকরা অংশ নেন।

মারাক্কেশে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মরক্কোর পর্যটন শহর মারাক্কেশে ৭ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ কাঠামো সনদের ২২তম বৈশ্বিক সম্মেলন। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা চূড়ান্ত করা, প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে অর্থের যোগান এবং সে অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে এবারের সম্মেলনে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও প্যারিস চুক্তি নিয়ে আগামী বছর আলোচনা হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মারাক্কেশ ঘোষণার মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে সম্মেলন। এ ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাকে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে রাষ্ট্রগুলো। সেজন্য প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে ১৯৩টি রাষ্ট্র। সম্মেলনের সমাপনী দিনে আয়োজক সংস্থা ইউএনএফসিসি'র ওয়েবসাইটে এ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়লাভের পর প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশা দূর করে আশার কথা শুনিয়েছেন জাতিসংঘের মাহসচিব বান কি মুন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ট্রাম্প জলবায়ু চুক্তির বিষয়ে ভালো ও বিজ্ঞের মতো সিদ্ধান্ত নেবেন। ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবেন, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। **প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

দুর্দান্ত জয়ে টাইগারদের বাঁধভাঙা উল্লাস

ওয়ানডে জয়ের সেঞ্চুরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, এমনকি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালও খেলেছে বাংলাদেশের টাইগার ক্রিকেটাররা। তবে টেস্ট ক্রিকেটে এতদিন বিশ্বকে চেনাতে পারছিল না টাইগাররা।

ইংল্যান্ডকে ১০৮ রানের বড়ো ব্যবধানে হারানোর আগে সাতটি টেস্টও জিতেছিল টাইগাররা কিন্তু সেসব ছাপিয়ে গেছে ইংল্যান্ডকে তিনদিনে গুঁড়িয়ে দিয়ে এই বড়ো জয়ের মাধ্যমে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনন্য এই জয়ই বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিং-এ চার নম্বরে আছে ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ অনেক দূরে। ইংল্যান্ডের মতো ধারাবাহিক শক্তিধর দলকে তিনদিনেই হারিয়ে দেওয়া আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের বড়ো অর্জন। আমাদের বিশ্বাস, সামনে এর চেয়ে বড়ো অর্জন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ আসছে সামনের বছরে। সিরিজের প্রথম টেস্ট চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জিততে জিততেই পরাস্ত হয়েছি আমরা। হয়ত ভাগ্য আমাদের অনুকূলে ছিল না। ভুল শুধরে মিরপুর টেস্টের এই অর্জন সম্ভব হলো।

সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষে মিরাজ

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড সিরিজে ১৯টি উইকেট নিয়ে ম্যাচে সিরিজ সেরা হয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি অসাধারণ রেকর্ড। আর এই রেকর্ড গড়েছেন জাতীয় দলের টেস্টে অভিসিক্ত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। মিরাজের ঘূর্ণিযাদুতে কুপোকাত শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টও জয়ের সাধ পেল টাইগাররা। আনন্দে ভাসছে খুলনাবাসীও। মিরাজ খুলনার কৃতী সন্তান।

সাকিবের অভিনব স্যালুট

গত বছর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রানাডা টেস্টে বেন স্টোকসকে আউট করার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারলন স্যামুয়েলস স্যালুট দিয়ে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান। একই ভঙ্গিতে মিরপুরে স্টোকসকে আউট করার পর বিশ্বসেরা অল রাউন্ডার সাকিব আল হাসান স্যালুটের মাধ্যমে উইকেট পাওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপন করেন।

ইমরুলের ১০০০ রান

অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের মাটিতে ১০০০ রান পূর্ণ করেছেন ইমরুল কায়েস। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট শুরুর আগে ঘরের মাঠে ইমরুলের সংগ্রহ ছিল ৯২৩ রান। দুই ইনিংসে ১ ও ৭৮ রান করার মধ্যদিয়ে ১৭ ম্যাচে ১০০২ রান করেন বাংলাদেশ দলের এই ওপেনার। নিজেদের মাঠে ৩০ ম্যাচে ২২০৭ রান তুলে তালিকার শীর্ষে আছেন তামিম ইকবাল।

পরিশেষে বলতে হয়, রেকর্ড বই ইংল্যান্ডের এই সফরটাকে মনে রাখবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অর্জনের সফর হিসেবে। ইংল্যান্ডের এই সফরে বাংলাদেশের প্রথম কোনো বড়ো দলের বিপক্ষে বড়ো ব্যবধানে টেস্ট জেতার গৌরব অর্জন। এই সফরে বাংলাদেশ অল্পের জন্য মিস করেছে ওয়ানডে এবং টেস্ট সিরিজ। কিন্তু ইতিহাস মনে রাখবে, এই সফরটাতে ক্রিকেটের চেয়েও ইংল্যান্ড বড়ো করে তুলেছে সম্প্রীতি।

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ :dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 5 November 2016, Tk. 25.00

ঋতু বৈচিত্র্যে আবর্তিত বাংলার প্রকৃতিতে আবার এলো শীত

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা